Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ কিসে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা ইয়াসমিন

রোলঃ 23090121073

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ কিসে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা ইয়াসমিন

রোলঃ 23090121073

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ কিসে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা ইয়াসমিন, আইডিঃ 23090121073 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ কিসে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

yeasmin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

হুমায়রা ইয়াসমিন

আইডিঃ 23090121073

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা.....5

প্রকৃত সুখ কী.....5

দুঃখ কেন আসে?.....10

সকল পরিস্থিতিতে সবরই প্রকৃত সুখ.....12

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লিখিত তাকদীরের উপর ধৈর্য্যধারণ :.....15

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে.....17

দুনিয়ার চিন্তা মাথায় না নেয়াই প্রকৃত সুখ.....18

তুচ্ছ বিষয়ে না জড়ানো.....19

আমরা সবাই সুখী হতে চাই.....20

সুখ ও সফলতার রহস্য.....22

সদা হাস্যমুখ রাখা.....24

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা.....27

বিনয়ী হওয়া.....30

লজ্জাশীল হওয়া.....33

পূর্ণ ঈমানি জীবন গঠন.....44

তওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে সুখ অর্জন.....47

সুখী থাকতে চাইলে হিংসা ও অহংকার পরিত্যাগ.....48

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার.....49

কৃপণতা সুখে থাকার প্রতিবন্ধকতা.....52

সন্দেহ ও কুধারণা পরিহার.....55

শেষ কথা.....60

মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা

মানুষ সুখ প্রেয়সী প্রাণী।আমরা সবাই সুখে থাকতে চাই,সুখী হতে চাই,কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হলো চাইলেই কেউ সুখী হতে পারে না।আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুখী মনে হলেও প্রকৃত সুখ অনেকেই পাই না।আমরা সবাই সুখে থাকতে চাই ঠিকই কিন্তু কোন পথে আমাদের জীবনের প্রকৃত সুখ নিহিত,কিসে আছে অনাবিল শান্তি সেটাই আমরা ভুলে যাই।মরিচিকার মতো সারাটা জীবন আমরা সুখের সন্ধানে পার করে দেই কিন্তু দিনশেষে আমরা ব্যর্থ।আমাদের চাওয়া হলো একটু সুখ,প্রশান্তি,ভালো থাকা।আর রব্বের ইবাদাতে মনোযোগ দেয়ার জন্য ,রব্ব কে খালেস অন্তরে ডাকার জন্য হলেও প্রশান্তির প্রয়োজন রয়েছে।কিন্তু মানুষের প্রকৃত সুখ আসলে কিসে?গাড়ি,বাড়ি,টাকা পয়সা,ধন সম্পদ এগুলোই কী আসলে সুখী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নাকি সুখ এগুলোর মাঝে নিহত নয়?এগুলো আমাদের পার্থিব ভাবনা সত্যিকার অর্থে প্রভাব প্রতিপত্তি দুনিয়াবি ভোগ সামগ্রী দিয়েই আসলেই সুখ পাওয়া যায় না।প্রকৃত সুখ এগুলোর মাঝে নেই।প্রকৃত সুখ হলো আত্মার প্রশান্তি যা রব্বের সান্নিধ্যে গেলেই কেবল অর্জিত হয়।

সুখের জীবন হচ্ছে দুটি:

(১)ইহলৌকিক সুখ,

(২)পারলৌকিক সুখ।

ইহলৌকিক সুখ পরিপূর্ণ ভাবে কারোরই পাওয়া সম্ভব না।কারণ সুখ,দুখ নিয়েই মানুষের জীবন।কেউ সারাজীবন সুখে দিন কাটাতে পারে না,আর কারো জীবন সবসময় কষ্টে কাটে না।কিন্তু ইহলৌকিক সুখ ক্ষনস্থায়ী হলেও আমরা মুমিন মুসলিমরা একটা আশা নিয়েই বেচে থাকি যে,দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জিন্দেগী শেষ হলেই আখিরাতে আমাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি অপেক্ষা করছে।সেই আশাতেই প্রতিটি মুমিন,মুসলিম তার সকল কষ্ট কে বুকের মাঝে চাপা দিয়ে রাখে।আর সত্যিকার অর্থে যিনি মুমিন তিনি কখনো ক্ষনস্থায়ী সুখ পাওয়ার মানসে চিরস্থায়ী সুখের জীবন নষ্ট করে না।সে কখনোই দুনিয়া অর্জনের জন্য আখিরাতকে হেলাফেলা করে না।

প্রকৃত সুখ কী

প্রকৃত সুখী মানুষের পরিচয় প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

‘সম্পদের প্রাচুর্য সচ্ছলতা (সুখ) নয়, বরং সচ্ছলতা (সুখ) তো হলো হৃদয়ের সচ্ছলতা।’ সহিহ্ বোখারি : ৬৪৪৬

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ইমান (দৃঢ় বিশ্বাস) ও তাওয়াক্কুলই (ভরসা, নির্ভরতা) মানুষকে

প্রকৃতপক্ষে ধনী অন্তঃকরণ দান করে, যার ফলে সে গরিব হয়েও দান করতে ভয় করে না। অপরপক্ষে আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস ও নির্ভরতা দৃঢ় নয়, সে অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়েও, গরিব হয়ে যাওয়ার ভয়ে দান করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাকে সর্বদা মুখাপেক্ষী করে রাখেন। এ প্রসঙ্গে অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, 'যে ব্যক্তি একমাত্র দুনিয়াকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে, আল্লাহ তাকে তিনটি বিষয় দেবেন। ১. তার চোখের সামনে দারিদ্র্য ঝুলিয়ে দেবেন। ফলে যতই টাকা-পয়সার মালিক হোক না কেন, কখনো তার অভাব দূর হবে না। ২. তার যাবতীয় কার্যক্রমকে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। ফলে কোনো কাজ সে গোছাতে পারবে না। একদিকে টান দিলে অন্যদিকে ছুটে যাবে। সারাক্ষণ মানসিক অস্থিরতার ভেতর অতিবাহিত করবে। ৩. এতসব করার পরেও তাকদিরে নির্ধারিত রিজিকের বাইরে সে কিছুই পাবে না।

আর যে ব্যক্তি একমাত্র আখেরাতকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করবে। আল্লাহতায়ালা তাকেও ৩টি বিষয় দেবেন। ১. তার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেবেন, তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। ফলে মানসিক অস্থিরতা থেকে সে পরিত্রাণ পাবে। মনের ভেতরে সব সময় এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করবে। ২. তার যাবতীয় কার্যক্রম গুছিয়ে দেবেন। ফলে কোনো কাজেই তার অতিরিক্ত পেরেশানি পোহাতে হবে না। ৩. আর দুনিয়া তার সামনে নত হয়ে হাজির হবে।' ইবনে মাজাহ : ৪১০৫

কুরআন ও হাদিসের আলোকে মানুষের প্রকৃত সুখ আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা, সৎকর্ম, এবং মানসিক শান্তি অর্জনে নিহিত, যা পার্থিব ধন-সম্পদ বা জাগতিক অর্জনের মাধ্যমে আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জীবন সংকীর্ণ হয়, কিন্তু যারা তাঁর স্মরণে থাকে তারা অন্তরের প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করে।

মুমিন ঈমানের মাঝে সুখ চায়,কাফের কুফুরীর মাধ্যমে সুখ চায়,ব্যভিচারী ব্যভিচারের মাধ্যমে সুখ অনুভব করে,মদ্যপানকারী মদ পান করে সুখ পায়,দাতা দান করে সুখ পায়,ভ্রমণকারী ভ্রমণ করে সুখ পায়,আশেক তার মালিকের সান্নিধ্যে সুখ পায়,আর প্রকৃত মুমিন তার রব্বের সান্নিধ্যে সুখ পায়।

একেকজনের সুখ তালাশের ডেফিনেশন একেক রকম, বাইরে থেকে আমরা অনেককেই দেখে সুখী মনে করি,যাদেরকে দেখে আমরা তাদের মতো সুখ কামনা করি,তাদের দেখে আফসোস করি আবার অনেকে তাদের দেখে হিংসা ও করে থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী তারা সুখী?আসলেই কী তারা ভালো আছে?নাকি দুখের কালো অন্ধকার তাদেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে?নাকি লোকচক্ষুর আড়ালে তারাও অশ্রু দিয়ে বুক ভাসায়?

দুনিয়াতে কিছু মানুষ আছে যারা পার্থিব জীবনের সুখকেই প্রকৃত সুখ মনে করে,তাদের কাছে দুনিয়ার ভোগ বিলাস,আসবাব ই সবকিছু। তারা মনে করে সুখী হতে বড় বড় অট্টালিকা,দামি দামি গাড়ি,বিলাশবহুল জীবন ই যথেষ্ট। কিন্তু দিনশেষে তারাও সুখী না,তাদের মাঝেও এক

অদৃশ্য হাহাকার কাজ করে,তারাও চাপা কষ্ট বুকে লালন করে বেড়ায়।তাই আমাদের উচিৎ প্রকৃত সুখের ডেফিনিশন টা ভালো ভাবে জানা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।
কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত সুখের মূল উপাদান:

- **আল্লাহর আনুগত্য:** আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি।মহান রব্বের দেয়া আদেশ গুলো যথাযথভাবে মেনে চলা তার নিষেধ গুলো থেকে দূরে থাকা,সর্বদা ঈমানের যত্ন নেয়ার মাঝেই প্রকৃত সুখ নিহিত।আমরা রব্বের সাথে দুরত্ব বাড়িয়ে দুনিয়ার সুখের পিছনে লাগাতার ছুটে চলি,কিন্তু রব্ব যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার ও দুনিয়াও অন্ধকার আর আখিরাত ও বরবাদ।আর রব্বের আনুগত্যে যারা জীবন পরিচালনা করে রব্ব তাদের দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি দুটোই দান করেন।প্রকৃত সুখী তো সেই জন রব্বকে যে বানিয়েছে তার প্রিয়জন।মহান রব্বের অপার করুণা যারা পেয়েছে তারা চিরসুখী হয়েছে।তাদের দুনিয়া এবং আখিরাত দুইজায়গাতেই পরম শান্তি আর যে একবার রব্বের ক্রোধে নিপতিত হয়েছে সে যতোই সুখের পিছনে ছুটে চলুক না কেন তার জীবনে সুখ দেখা দিবে না।সে হবে হতভাগ্য দের একজন।তার দুনিয়ার জীবন ও হতাশায় নিমজ্জিত আর আখিরাত ও হবে আজাবে জর্জরিত।দোজাহানেই তার হতাশার সীমা থাকবে না,পক্ষান্তরে যেই সত্তা রব্বের সন্তুষ্টি তালাশ করে জীবন পরিচালনা করেছে,রব্বের আনুগত্যের উপর চলেছে তার দোজাহানেই প্রশান্তি আর অনাবিল শান্তি। কোনো হতাশা,ক্লান্তি,কষ্ট-ক্লেশ
- ***ঈমান ও নির্ভরতা:*** আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর উপর নির্ভর করা একটি ধনী অন্তরের লক্ষণ, যা সম্পদশালী হলেও অভাবী হতে ভয় করে না, কারণ সে জানে আল্লাহই তার রিজিকদাতা।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ই সকল পরিস্থিতিতে তাকে রক্ষা করবেন,রব্ব যার হয়ে গিয়েছেন তার কিসের ভয়,কেউ যদি পৃথিবীর সকল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে ও যায় কিন্তু রব্বের সন্তুষ্টি তার উপর না থাকে তাহলে সে কী পেলো? আর যে দুনিয়াবি কোনো বিলসিতা পেলো না কিন্তু রব্ব কে পেয়ে গেলো তার হারানোর মতো কী আর আছে?যার রিজিকের দায়িত্ব স্বয়ং রাব্বে কারীম নিয়েছেন তার কিসে আর হতাশা?সে কখনোই দারিদ্রতাকে ভয় পায় না তার নিকট রব্বের সন্তুষ্টি ই সবচেয়ে বড় সম্পদ।সে রব্বের উপর নির্ভরশীল হয়,সকল প্রতিকুলতায় রব্বের উপর তাওয়াক্কুল করে।রব্বের সকল সিদ্ধান্তে সে একাগ্রতা প্রদর্শন করে।কখনো কোনো প্রতিকুলতা তাকে বিচলিত করতে পারে না।এক আল্লাহ এর উপর ই তার ভরষা।
- **সৎকর্ম ও ত্যাগ:** সৎপথে জীবিকা নির্বাহ করা,হালাল রুজি দিয়ে জীবন পরিচালনা করা সুখে থাকার আরেক মাধ্যম। রুজি যদি হালাল হয় তবে অল্পতেই অনেক বারাকাহ পাওয়া যায়।হালালেই সকল শান্তি,সকল রহমত,সকল বরকত।যে সৎপথে চলতে চায় তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৎ পথের দিশা দেন।তারজন্য সকল প্রতিকূলতা কে

সহজ করে দেন।সৎকর্মের পাশাপাশি তার মাঝে ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি হয়,সে অন্যের জন্য কাজ করতে আনন্দ উপভোগ করে,অন্যের তরে জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একজন সৎ ব্যক্তি ই দেশ ও দশের জন্য অকাতরে কাজ করে যায়,সৎ ব্যক্তি হচ্ছে অমূল্য রত্নের মতো যা এখন পাওয়াই দুর্লভ ,একজন সৎ ব্যক্তি পুরো সমাজ,দেশ,রাষ্ট্রের জন্য গর্ব।তাই জীবনে প্রকৃত সুখী হতে হলে সৎ থাকার বিকল্প নেই।হারামে কখনোই আরাম নেই,হারাম বাহ্যিক দৃষ্টি তে সুন্দর এবং লোভনীয় মনে হলেও আত্মিক দিক দিয়ে এর কোনো ফায়দা নেই।হারামের জন্য জীবন বিষাদময় হয়ে উঠে,জীবনে কোনো বারাকাহ থাকে না।

- **অন্তরের প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি:** প্রকৃত সুখ হলো অন্তরের গভীর প্রশান্তি ও তৃপ্তির এক অবস্থা, যা কেবল আল্লাহর স্মরণে আসে।যার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে যতো পেরেশান থাকে তার অন্তর ততো প্রশান্ত এবং উদ্দীপ্ত।রব্বের ইবাদাতে,রব্বের সান্নিধ্যে,রব্বের গুণগানে অন্তরে যে সুকুন মিলে সেটা অন্য কিছু দিয়ে পাওয়া সম্ভব না।যেই বান্দার রব্বের সাথে সম্পর্ক যতো গভীর তার দুনিয়াবি পেরেশানি ততো কম।শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যেই যা পাওয়া সম্ভব।অন্তরের সকল কলুষতা,অন্তরের সকল ব্যাধি দূর হয় শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার স্মরণে। তাই একটি প্রশান্ত আত্মা পেতে,জীবনে প্রকৃত সুখ ও অনাবিল আনন্দ পেতে স্রষ্টার ইবাদাতের বিকল্প নেই।
- **আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি:** নিজের যা কিছু আছে, তা নিয়েই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করা সুখী হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।যার যতো বেশি চাহিদা সে ততো অসুখী।নিজের নফসকে খাহেশাত থেকে যতো দূরে রাখতে পারবো,নিজের প্রবৃত্তি কে এটা বুঝানো যে আমার রব্ব খুশি হয়ে আমাকে যা দিয়েছেন তাতেই আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার আসবাব আমার কম থাকলেও আমার রব্বের সন্তুষ্টি আমার মাঝে বেশি থাকুক।রব্বের পরিকল্পনাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে যেই হালতেই রাখবেন সেই হালতেই আমি আলহামদুলিল্লাহ,তখনই সত্যিকার সুখের দেখা পাবো আমরা।কখনো নিজেকে অপরের সাথে তুলনা দিয়ে স্রষ্টার নাফরমানী তে লিপ্ত হওয়া উচিৎ না।আমাদের এই সুস্থ দেহটার দিকে তাকিয়ে সর্বপ্রথম শুকরিয়ার সাগরে আমাদের ডুব দিতে হবে।সেই সত্তা কতো মহান যেই সত্তা হাজারো অর্ধবিকলঙ্গ মানুষের মাঝে আমাকে সুস্থ হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। চাইলেই তিনি আমাকে জন্মগত বিকলাঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি করতে পারতেন কিন্তু মহান রব্ব তা করেন নি,তিনি আমাকে সুস্থ একটি মস্তিষ্ক দিয়েছেন যা দিয়ে আমি ভালো,মন্দ যাচাই করতে পারি।সুস্থ দুটো চোখ দিয়েছেন যা দিয়ে আমি সারা পৃথিবী দেখতে পারি।দুটো শক্তিশালী পা দিয়েছেন যা দিয়ে আমি যেখানে খুশি হেটে বেড়াতে পারি।দুটো সুঠাম হাত দিয়েছেন যা দিয়ে সকল কাজ সম্পাদন করতে

পারি।অনবরত আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন দিচ্ছেন যাতে আমরা বেচে থাকতে পারি।আকাশ থেকে আমাদের জন্য বারি বর্ষণ করছেন,জমিনে আমাদের খাদ্যের যোগান দিতে ফসল ফলাচ্ছেন,পৃথিবীটা মানুষের উপযোগী করার জন্য সবুজ গাছপালা তৃণলতা দিয়েছেন,আমাদের জন্য পৃথিবী টা যেনো আরো সুন্দর আর প্রাণবন্ত হয় সেই জন্য আমাদের সঙ্গে আমাদের জোড়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন,মা বাবা,ভাই,বোন,সন্তান্াদি,পরিবার,পরিজন সকল কিছু দিয়ে আমাদের তিনি নেয়ামতের সাগরে নিমজ্জিত করে রেখেছেন।যেই নেয়ামত এর শুকরিয়া আমরা কেয়ামত পর্যন্ত আদায় করেও শেষ করতে পারবো না।তিনিই রব্ব যিনি এত নেয়ামত দেয়ার পর ও বান্দা যদি অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তাহলে বান্দাকে পাকড়াও করেন না।তার খাবার বন্ধ করে দেন না,তার পানি বন্ধ করেন না,তার অক্সিজেন কেড়ে নেন না,তাকে পৃথিবী বাসীর কাছে অপদস্ত করেন না।শত বছর নাফরমানী করার পর ও যদি কায়মনোবাক্যে কোনো বান্দা তার কাছে ২ ফোটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই বান্দার শত বছরের নাফরমানী ক্ষমা করে দেন।কীভাবে সেই রব্বের শুকরিয়া আদায় না আদায় করবো?যেই রব্ব আমাদের এতো এতো নেয়ামত দিয়ে ফুবিয়ে রেখেছেন,সারা পৃথিবীর সকল বৃক্ষরাজি কে কলম বানিয়ে আর সাগরের পানিকে কালি বানিয়েও যদি তার নেয়ামত এর শুকরিয়া আদায় করতে শুরু করি,সাগরের পানি শুকিয়ে যাবে কিন্তু আমার রব্বের দয়া এবং করুণার শুকরিয়া আদায় শেষ হবে না।সামান্য একটু কষ্ট পেলে,জীবনে অন্ধকার হালকা করে কড়া নাড়লেই আমরা হতাশ হয়ে যাই,বছরের পর বছর ধরে রব্বের দেয়া যেই নেয়ামত গুলো ভোগ করে আসতেছি এক নিমিষেই সব ভুলে যাই।মূহুর্তের মধ্যেই নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যাই।কিন্তু আসলেই কি আমাদের চরিত্র এমন হওয়ার কথা ছিলো? আমরা শ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হিসেবে কী আমাদের চরিত্র এমন দুমোখো হওয়ার কথা ছিলো? একদমই না।আমাদের জীবনকে সাজানোর কথা ছিলো পবিত্র তাকওয়া,খোদাভিরুতা এবং অল্পে তুষ্টি দিয়ে।সকল পরিস্থিতিতে রব্বে কারীমের শুকরিয়া আদায় করা এবং রব্বের সকল আদেশ নিষেধ এ সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।নিজের জীবনকে ঈমানী নূর দিয়ে সাজালেই জীবনে প্রকৃত সুখ মিলবে,রব্বের সন্তুষ্টি তে জীবন অতিবাহিত করলেই জীবনের আসল সুখ পাওয়া যাবে।

- **দুঃখ কী এবং তা কেন আসে আমাদের জীবনে:**সুখের বিপরীত হলো দুঃখ। এটা হচ্ছে মনের ব্যাপার জীবনের প্রত্যেকটি কষ্ট,আঘাত,যাতনা,ব্যর্থতা,প্রিয়জনের বিয়োগ,অভাব-অনটন,লোকের কটু কথা,শত্রুতা সকল কিছুকে আমরা এক নামে চিনি সেটা হচ্ছে

দুঃখ।এই দুঃখ একেকজনের একেক রকম।কারো দুঃখ আত্মিক আবার কারো শারীরিক আবার কারো মানসিক।

যারা জীবন পাপ দিয়ে পরিপূর্ণ ,নিজের নফস গুনাহ দিয়ে কলুষিত তার জীবনে আত্মিক কোনো সুখ নেই তাই সে আত্মিক কষ্টে ভোগে।তার সকল কাজেই পিছিটান,ব্যর্থতা।অপরদিকে যার ঘরে খাবার নেই,পরনে পোশাক নেই সে ভোগে শারিরীক দুঃখে তার এই কষ্ট লাঘব হবে খাবার পেলে,পোশাক পেলে।

আবার কারো সব আছে কিন্তু পাবিবারিক কলহের কারণে মনে শান্তি নেই,সকল সুখ আছে শুধু নিজের প্রিয়জন হারিয়ে গিয়েছে সে আচগে মানসিক কষ্টে। তার এই কষ্ট কোনো সম্পদ বা আসবাব দিয়ে দূর হবে না।কিছু জিনিস আছে যা অল্প হলেও বেশি লাগে মানে অল্পতেই মানুষ কাতর হয়ে যায়।আগুন ও শত্রুতা তেমন ই দুটি জিনিস তার বিপরীতে আছে দুঃখ-বেদনা।

দুঃখ আসে মনের গহীন কোণে আর এসেই অন্তরে আঘাত করে যার কারণে একটু দুঃখ,কষ্ট পেলেই মানুষের চোখে অশ্রু এসে যায়।আর অশ্রু হচ্ছে দুঃখ লাঘবের মাধ্যম। কষ্টের সময় একটু অশ্রু বিসর্জন দিলেই কষ্ট টা অনেকাংশে কমে যায়।অন্তর প্রফুল্ল হয়ে যায়।বুকটা যে অনেক ভারি জয়ে ছিলো সেটা শীতল হয়ে যায়।তাই মানুষ কষ্ট পেলেই কাদে,কখনো দুনিয়াবি মানুষের কাছে কাদে,কখনো সন্তান তার মায়ের কাছে কাদে,কখনো স্ত্রী তার স্বামীর কাছে,কখনো গোলাম তার মালিকের কাছে।

আর বিশ্বাসী অন্তর,সবরকারী অন্তর জায়নামাজে কাদে তার রব্বের নিকট।আর সর্বোত্তম কান্না মহান রব্বের নিকট তার বান্দার চোখের পানি।এর চেয়ে উত্তম কোনো কান্না নেই।কারণ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত ছাড়া আমার কান্না মোছনকারী আর কেউ নেই তাই আমাদের সকলের উচিৎ যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের রব্বের নিকট ফরিয়াদ করা,মনের সকল আকুতি,সকল মিনতি,সকল মাকসাদ রব্বের নিকট পেশ করা কারণ তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।যারা কাছে হাত বাটিয়ে দিলে তিনি কখনো খালি হাতে ফেরান না,যাকে একবার ডাকলে তিনি বারবার সাড়া দেন।যার দিকে আমরা হেটে গেলে তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসেন।তাই সকল পরিস্থিতিতে আমাদের উচিৎ রব্বের শরণাপন্ন হওয়া।

দুঃখ কেন আসে?

আমাদের জীবনে দুঃখ,কষ্ট,যাতনা আসে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ,যখন আমাদের দিয়ে গুনাহ হয়ে যায়,আমরা বারেবারে রব্বের অবাধ্য হই তখন মহান রব্ব আমাদের ফিরে আসার জন্য আমাদের বিপদ,আপদ,মসিবত দেন।কারণ রব্ব জানেন,বান্দা বিপদে পড়লে তার নিকট আসবেন,সকল দ্বার যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন ও তার রহমতের দ্বার বান্দার জন্য সদা উন্মুক্ত

থাকবে।তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের বিপদ,আপদ,বালা,মসিবত দেন।বিপদ প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে থাকে আর যখন আমাদের জীবনে পাপ কমে যায় তখন বিপদ ও কমে যায়।রাসুলুল্লাহ ((সা:) বলেছেন: "কোনো মুমিনকে যখনই কোনো রোগ বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট দেয়া হয়,তখনই আল্লাহ তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন,যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলিকে ঝরিয়ে থাকে।"।(বুখারী ৫৬৪৮,মুসলিম ২৫৭১)দুঃখ দিয়ে বান্দার ঈমান পরিক্ষা হয়,আর এ পরীক্ষা এমন কঠিনতর হয় যে বান্দার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়।বান্দার রব্বের প্রতি তাওয়াক্কুল, আত্মবিশ্বাস,ভরষা,সবর পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাজারো বিপদ,আপদ,মসিবত দেন।

ধরুন, এক দম্পতির দীর্ঘদিন পর্যন্ত সন্তান হয় না,অনেক দোয়া করে ,রব্বের নিকট অনেক ধর্ণা দিয়ে তাদের একটা সন্তান পৃথিবীতে আসলো।সেই সন্তান বড় হচ্ছে আর মা বাবার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে।তাদের এই অনাবিল সুখের মহড়ায় হঠাৎ একদিন চরম দুঃখ নেমে আসলো,তাদের সন্তান পানিতে ডুবে মারা গেলো। চিন্তা করুন তো কতো কঠিন এই পরিক্ষা,কতো কঠিন এই পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।যার নেই তাকে একেবারেই নিস্তেজ করে দেয়ার মতো। কতো কঠিন হবে সেই মূহুর্তের সবর।

আবার সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল যুবক হঠাৎ করে রোড এক্সিডেন্ট বা অন্য কোনো ভাবে মারা গিয়ে মা এবং ছোট ভাই বোনদের দুঃখ ও শোকের সাগরে ভাসিয়ে দেয়া।সেই পরিবার টার কথা কল্পনা করলে বুঝা যায় তাদের জন্য এই পরীক্ষা টা কতোটা কঠিন থেকে কঠিনতর।কোন পরিস্থিতির মাঝে তারা সবরের পরীক্ষা দিতে হয়।

তেমনিভাবে অনেক বয়স হয়ে যাবার পর ও এক যুবতীর বিয়ে হচ্ছে না।হাজারো দোয়ার বিনিময়ে,হাজারো চোখের অশ্রু বিসর্জন এর পর যখন তার বিয়ে হলো তাকদীর তারপর ও তার সহায় হলো না।হঠাৎ তার স্বামী স্ট্রোক করে মারা গেলো ভেবে দেখুন এই পরিস্থিতিতে সবর করা কতো টক চ্যালেঞ্জিং। কতো কঠিন এই পরীক্ষা!কতো বড় ঈমানের পরীক্ষা!

কিন্তু আমাদের জীবনে যতো কঠিন পরিস্থিতি ই আসুক না কেন আমাদের সবসময় ধৈর্য আর সবরের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। সকল পরিস্থিতিতে এটা মনকে জানান দিতে হবে আমার একজন রব্ব আছেন যিনি সকল মন তার আর কষ্টের প্রতিষেধক বিক্রি করেন।আমার জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে যিনি আমাকে রক্ষা করবেন।আর খানিকটা পথ পেরোলেই তো রব্বের জান্নাত,আর একটু যাতনার পরেই তো চিরসুখের সেই বাসস্থান যার তলদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত।প্রত্যেক টা পরিস্থিতিতে অন্তর কে এটা জানান দিতে হবে

"আমার রব্ব উত্তম পরিকল্পনাকারী"

দুঃখ আসে মুমিন বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। মহানবী ((সা:) বলেছেন ,

"আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে,কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌছতে অক্ষম হয়,তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার দেহ,সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বালা মুসিবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন।অতঃপর এতে তাকে ধৈর্য ধারণ করার

ও তাও দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আযযা ওজাল্লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওই মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়"!(আহমদ,সহীহ আবু দাউদ ২৬৪৯ নং)

বিপদ,আপদ,বালা,মসিবত মানুষকে কষ্ট দিতে আসে না আসে মানুষকে নতুন ভাবে তৈরী করতে।পূর্বের চেয়ে আরো মজবুত করে সৃষ্টি করতে।স্বর্ণকার আর কামার যেমন স্বর্ণ এবং লোহাকে আগুনে পুড়িয়ে খাটি করে।তেমনি মহান রব্ব ও মানুষকে বিপদ,আপদ,বালা-মুসিবত দিয়ে মানুষের ঈমানকে খাটি করেন।স্বর্ণকে যেমন পুড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে নতুন ডিজাইন তৈরী করা হয় তেমনি মানুষকে কষ্ট,দুঃখ,যাতনা দিয়ে রব্বের জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করা হয়। লোহাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে বিভিন্ন আসবাব বানানো হয় তেমনি বান্দার গুনাহ গুলো কে বিপদের দ্বারা মিটিয়ে দেয়া হয়। যতক্ষণ বান্দার আমলনামা থেকে গুনাহ পরিপূর্ণ ভাবে মুছে না যায় ততক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীল বিপদ,আপদ,মসিবত দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করতে থাকেন।মুমিন বান্দার ক্ষেত্রে মহান রব্ব তার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তাকে সতর্ক করার জন্য তাকে বিপদে আপতিত করেন।তখন মুমিনের অন্তরে জানা হয়ে যায় যে আমার দ্বারা এই পাপ টা হয়ে গিয়েছে দেখেই হয়তো মহান রব্ব আমাকে এই বিপদে আপতিত করেছেন।তখন সে সেই গুনাহ থেকে ফিরে এসে রব্বের নিকট একান্ত চিত্তে তওবা করে এবং আর কখনো সেই পাপে জড়িত হবে না বলে সংকল্প করে।আর নাফরমান ,অবাধ্য ব্যক্তি গুনাহ এর পর গুনাহ করতেই থাকে হাজারো বিপদ,আপদ,সতর্ক বার্তা আসলেও সে তার গুনাহে অটল অবিচল থাকে।তখন রব্ব ডেকে বলেন, " **আমি ছাড় দেই কিন্তু ছেড়ে দেই না**"। যতোই তালবাহানা করো না কেন বান্দা আমার কাছে তোমাকে ফিরতেই হবে।আমি ই সেই রব্ব যে তোমাকে কোনো অস্তিত্ব ছাড়াই সৃষ্টি করেছি,পৃথিবীতে তোমাকে সম্মানিতদের কাতারভুক্ত করেছি।আবার আমি ই আবার তোমাকে মৃত্যু দান করি এবং আমি ই মৃত্যুর পর তোমাকে পুনর্জীবিত করবো।আমার থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।কেবল মানুষ ই কাদতে কাদতে জন্মায়,অভিযোগ করতে করতে বাচে আর আক্ষেপ করতে করতে মরে।জীবন টা মনোরম সুন্দর এক গোলাপের মতো এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে কাটার আঘাত সহ্য করতেই হবে।দুঃখের পর ই সুখের আলিঙ্গন হয়।জীবনে দুঃখ না থাকলে সুখের কোনো মূল্য ই থাকতো না।

সকল পরিস্থিতিতে সবরই প্রকৃত সুখ

জীবনের সকল প্রতিকূলতা,সকল মসিবত,সকল পরিস্থিতিতে সবরের কোনো বিকল্প নেই।প্রতিটা খারাপ সময়ে রব্বের উপর তাওয়াক্কুল আর সবর বান্দার মূল সোপান।যেই বান্দার জীবনে সবরের শক্তি বেশি সেই বান্দা সফল বেশি,সেই বান্দার ঈমানের জোর বেশি।আমাদের জীবন সুখ,দুঃখের মেলবন্ধনে গঠিত,এমন কোনো মানুষ নেই যে সারাটা জীবন ই সুখে জিন্দেগী

পার করতে পেরেছেন আবার এমন মানুষ ও নেই যার গোটা জীবনই কষ্টে,দুর্দশায় কেটেছে।সুখ, দুঃখ মিলিয়েই জীবনের পথ চলা। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী ব্যক্তি সেই জন যে দুঃখকে সুখে রুপান্তর করে নিতে পেরেছে।সকল পরিস্থিতিতেই সবরের পরীক্ষা দিয়েছে।সকল প্রতিকূলতাকে নিজের ধৈর্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে সামলিয়ে নিয়েছে।তার জীবনে কোনো হতাশা নেই,কোনো পিছুটান নেই কারণ সে সকল পরিস্থিতিতে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে।সকল না পাওয়ার মাঝে সে পাওয়া কে খুজে নিয়েছে।সকল বেদনাতে সে প্রশান্তি তালাশ করে নিয়েছে।ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই আশা নিয়ে যে,কষ্টের পর আসান আছে, দুঃখের পর সুখ আছে,অমাবস্যার পর পূর্ণিমা আছে,রাত্রির পর সকল আছে,অন্ধকারের শেষে আলো আছে,আর আমাদের একজন রব্ব আছেন যিনি সকল মন খারাপের ঔষুধ বিক্রি করেন।সকল কষ্টের প্রতিষেধক দান করেন ,সকল পরিস্থিতি মোকাবেল করার শক্তি দান করেন।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ই পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে”(সূরা ইনশিরাহ-৫,৬)

কষ্ট পাওয়ার পর তা বাইরে প্রকাশ না করা,তাতে হতাশ না হওয়া,কোনো প্রকার অভিযোগ,প্রতিবাদ না করা,এবং খুব শীঘ্রই কষ্ট দূর হয়ে যাবে এই আত্মবিশ্বাস মনে লালন করার নাম ই সবর।কষ্টের সময় ভ্রু কুঞ্চিত না করা,বুক-পিঠ না চাপড়ানো,শরীরে আঘাত না করা,চুল না ছিড়া,বিলাপ করে কান্নাকাটি না করা,সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ না করা এগুলোই হচ্ছে সবর।সবর কারী অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেক পছন্দ করেন।তিনি তার সবরের জজবা আরো বাড়িয়ে দেন।দেহের সাথে মস্তিষ্কের যেমন সম্পর্ক ,ঈমানের সাথে সবরের ও তেমন সম্পর্ক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

“হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্যধারণ কর!ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে)সদা প্রস্তুত থাক।আর আল্লাহকে ভয় কর,যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”।[সূরা আল-ইমরান আয়াত ২০০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না,করলে তোমরা সাহস,শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের মনোবল বিলুপ্ত হবে।তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।[সূরা আনফাল আয়াত ৪৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধৈর্য ধারণ করা কে এতো পছন্দ করেন যে পবিত্র কুরআনের প্রায় ৯০ জায়গায় তিনি ধৈর্যের কথা আলোচনা করেছেন।সূরা বাকারাহ এর ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।বিনীতগণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য নিশ্চিতভাবে তা কঠিন কাজ”

তাই সকল প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের রব্বের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে ,রব্বের কাছে সবর করতে হবে,তাহলে তিনি আমাদের সে বিপদ থেকে অচিরেই রক্ষা করবেন এবং তা আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন।

ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর মুত্তাকী ,পরহেজগার ও নেককার লোকদের একটি মহৎ গুণ। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

পূণ্য আছে(ঈমান ও ইসলামের বিভিন্ন কাজে) এবং দুঃখ কষ্ট এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করলে,এবং এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং মুত্তাকী (সূরা বাকারাহ-১৭৭ নং আয়াত)

জীবনের সকল পরিস্থিতিতে,দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়,রব্বের দ্বার ছাড়া আর কোনো দ্বার যখন উন্মুক্ত থাকে না তখন ও আমাদের উচিৎ রাব্বুল আলামীনের নিকট সবরের পরীক্ষা দেয়া।কারণ ধৈর্য আর সবর হলো মুত্তাকী ও পরহেজগার বান্দার মহৎ গুণ।যেই গুণ কোনো অবাধ্যতায় লিপ্ত আর বেসবর অন্তরে বিদ্যমান থাকে না।তাই প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফিক দান করুক।

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

তুমি ধৈর্যধারণ করো!নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক লোকদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।(সূরা হুদ-১১৫ নং আয়াত)

ধৈর্য শীল ব্যক্তি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসা অর্জন করেন,মহান আল্লাহ পবত্র কুরআনে বলেন,

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন(সূরা ইমরান ১৪৬ আয়াত)

তাই কোনো বিপদ বা মসিবতে পড়লে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে দোষারোপ করা,তার উপর ক্ষুব্ধ হওয়া,তাকে দায়ী বানানো বে সবর নফসের কাজ।যেকোনো পরিস্থিতিতে এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করা,আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা একটি শোকরগোজার অন্তরের কাজ।কারণ বিপদ যতো বড় হয় মহান রব্ব তার প্রতিদান ও ততো বেশি দান করেন শুধুমাত্র যদি আমরা বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারি।নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।সকল প্রকার হতাশা,অবাদ্ধতা,অশ্লীলতা থেকে যদি নিজেকে দূরে রাখতে পারি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অগণিত নেয়ামত দ্বারা আমাদের পরিপূর্ণ করে নিবেন। অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন,তখন তিনি সেই জাতিকে বালা মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন।সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে,তার লাভ হয় সন্তুষ্টি। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়,তার লাভ হয় অসন্তুষ্টি (আহমআদ,তিরমিযী,ইবনে মাজাহ)

ধৈর্যশিলদের প্রতিদান দেয়া হবে রব্বের জান্নাত।তারা ধৈর্যের দ্বারা রব্বের নিকট থেকে জান্নাত অর্জন করে নেয়।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরষ্কার প্রদান করা হবে।(সূরা যুমার আয়াত নং ১০)

তিনি আরো বলেন,ওদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে,কারণ ওরা ধৈর্যশীল।ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে এবং আমি যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে(সূরা কাসাস আয়াত নং ৫৪)

সুবহান আল্লাহ মহান রব্ব পবত্র কুরআনে বারবার ধৈর্যশীল দের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।রব্ব ধৈর্যধারণ কে এতোই পছন্দ করেন যে তিনি এর বিনিময়ে জান্নাতের আহবান করেছেন।
তিনি আরো বলেন,
"যারা ঈমান এনে নেক কাজ করে,আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো,যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।সৎকর্মপরায়ণদের কতো উত্তম পুরষ্কার! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।(সূরা আনকাবুত ৫৮-৫৯ আয়াত)
মুমিন,মুত্তাকী ব্যক্তিরা সকল পরিস্থিতিতে তার রব্বের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকেন।সকল বিপদ,আপদে রব্বের সাহায্য চান তাই রব্বে কারীম তাদের জন্য এর বিনিময় হিসেবে জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের প্রবেশ করানো হবে এমন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হবে।তার সেখানে চিরকাল থাকবে। ধৈর্য মুমিনের এক অপরিহার্য সীফাত যা দ্বারা তারা রব্বের নিকট পৌছে যেতে সক্ষম হয়।মুমিন ব্যক্তি কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্তে নারাজ হোন না।সে এটা বিশ্বাস করে যে,
"আমার রব্ব উত্তম পরিকল্পনাকারী"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লিখিত তাকদীরের উপর ধৈর্য্যধারণ :

যে ঈমান নিয়ে মানুষ মুমিন হয় তার রুকন৬ টি,আর তার মাঝে ৬ষ্ঠ রুকন হলো তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবী ও আসমান মন্ডলী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন লাওহে মাহফুজে।পরে তা বিস্তারিত ভাবে লিখা হয়ে থাকে মাতৃগর্ভে আত্মা দানের পূর্বে,মানুষের রুজী,তার রিজিক,তার জন্ম ,মৃত্যু,মৃত্যুর স্থান, সৌভাগ্য,দূর্ভাগ্য সকল কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়।আবার প্রতিবছর রমজানে "লাইলাতুল কদর" বা শবে কদরে ও মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়।একজন মুমিন,মুসলিম এটা বিশ্বাস করেন যে মহান রব্ব তার জন্য যা উত্তম ভেবেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ই ভালো জানেন কী দান করলে তার বান্দার জন্য ভালো হবে।অনেক সময় আমরা সামান্য বিপদে আপতিত হলেই হতাশ হয়ে পড়ি,আমরা এমন ভাবে জীবন নিয়ে পেরেশানিতে পড়ি তখন মনে হয় ভাগ্য লিপিটা আমাদের হাতে থাকলেই হয়তো আমরা এই বিপদ টা দূর করে দিতে পারতাম।
"আল্লহুম্মাগফিরলী"
কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যেক বিপদ,আপদ,মসিবতের পর ই আমাদের জন্য রব্বের পক্ষ থেকে নেয়ামত অপেক্ষা করে।রাব্বুল আলামীন জানেন যে,কোন সময় আমাদের জীবনে কোন নেয়ামত টি আসলে আমরা তার যথাযথ হক্ব আদায় করতে পারবো।কখন আমরা কোন

জিনিসের কদর বুঝবো!তাই তিনি সেই উত্তম সময়েই আমাদের সেই নেয়ামত দান করেন।মহান রব্ব কারো উপর জুলুম করেন না।ভাগ্যলিপি তার হিকমতে ভরপুর,সুতরাং তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে আর যা চান নি তা হয় নি।আবার তিনি যা চাইবেন তাই হবে,কিন্তু যা তিনি অপছন্দ করবেন,করতে চাইবেন না তা কোনোদিন ও হবে না।

"মুসলিম আল্লহর সকল ফায়সালাকে নতশিরে মেনে নেয়,এবং তাতেই নিজের মঙ্গল আছে মনে করে।আল্লাহর তাকদীর ও বিচারের উপর ধৈর্য ধারণ করে।নিয়তির উপর সদা প্রস্তুত থাকে।আপাদদৃষ্টিতে নিজের ভাগ্যকে দূর্ভাগ্য মনে হলেও সেটাকেই সে নিজের জন্য শুভ ও অনুকূল মনে করে।কারণ সে জানে যে,আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনো তার প্রতি জুলুম করবেন না,শিশুর প্রতি মায়ের অনুকম্পা যতোটা,তারচেয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুকম্পা বহু গুণ বেশি।

[বুখারী ৫৯৯৯,মুসলিম ২৭৫৪]

সুতরাং যে তাকদীরে বিশ্বাস করে তার আবার দুশ্চিন্তা কিসের?যে নফস তার রব্বের উপর ভরষা করে তার আবার চিন্তা কিসের?

"হাসান বসরী (র:) বলেন, আশ্চর্য তার প্রতি যে তকদীরে বিশ্বাস রাখে অথচ সে চিন্তিত হয়,আশ্চর্য তার প্রতি,যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ সে আনন্দিত হয়;আশ্চর্য তার প্রতি যে দুনিয়া ও তার বিবর্তনের কথা জানে অথচ সে তার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়।"

একদা ইবরাহীম বিন আদহম এক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে তাকে বললেন,আমি তোমাকে ৩ টি প্রশ্ন করতে চাই,তুমি তার উত্তর দিবে কী?

লোকটি বললেন,অবশ্যই!

তখন তিনি বললেন,এ জগতে কী এমন কিছু ঘটেছে যাতে আল্লাহর ইচ্ছা নেই?

লোকটি বলল,না!

তিনি বললেন,তোমার রুযীর এতোটুকু কী কম হবে, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন?

লোকটি বলল,না!

তিনি আবার বললেন,তোমার আয়ু থেকে কী এতোটুকুও কম করা হবে,যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?

লোকটি বললো,না!

তখন ইব্রাহীম আল আদহম বললেন,তবে আবার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কিসের?

অতএব,আমাদের ও উচিৎ নিজের তাকদীরের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা।আমাদের রিজিকে যা আছে সাত আসমা ঘুরে হলেও তা আমাদের নিকট এসে পৌছাবে,আর যা আমাদের রিজিকে নেই তা আমাদের মুখের সামনে থাকলে আমরা তা মুখের ভিতর দিতে পারবো ন যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফিক না দিবেন।হয়তো মুখের সামনে থাকা খাবার টা

ও আমাদের হাত থেকে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে বা আমরা অসুস্থ হয়ে যাবো খাবার মুখে নেয়ার পরিস্থিতি আমাদের থাকবে না।

মহান রব্ব চাইলে কী না করতে পারেন,তিনিই তো সকল কিছুর কর্মবিধায়ক।তার হুকুমেই সকল সৃষ্টির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়।তিনি ই তো দিন এবং রাতের প্রবর্তক। তার হুকুমেই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পূব আকাশে সূর্য উঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়।তাই সকল পরিস্থিতিতে সেই সত্তার উপর ই আমাদের তাওয়াক্কুল করা উচিৎ। তাকদীরে রব্ব যা লিখেছেন তাই ঘটবে,আমরা কেউ তার পরিবর্তন ঘটাতে পারবো না তাই আমাদের উচিৎ যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রব্বের প্রতি কোনো অভিযোগ না করে সবরের পরিচয় দেয়া।অতএব, ভাগ্যের এই ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণকরা,অভিযোগ,অনুশোচনা,অনুতাপ,আক্ষেপ,হায়-হুতাশ,আর্তনাদ,বিলাপ,ক্ষোভ,আক্রোশ এগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা।মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই বানীকে অন্তরে বসিয়ে নেয়া যে,রাব্বে কারীম বলেছেন ,

অর্থাৎ,তুমি বল,,আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন,তা ব্যতীত আমাদের কিছুই হবে না।তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক।আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা রাখা উচিৎ। (সূরা তাওবাহ-৫১ আয়াত)

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লিপিবদ্ধ করা তাকদীরে বিশ্বাস ই আমাদের জীবনে প্রকৃত সুখ,অনাবিল শান্তি এনে দিতে পারবে।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহিহ বুঝ দান করুক।

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে

জীবনে চলার পথে হাজারো ঘাত-প্রতিঘাত,হতাশা,অপ্রাপ্তির মাঝে ও মানুষ একটা আশা নিয়েই বেচে থাকে আমাদের একজন রব্ব আছেন,যিনি সকল মন খারাপের প্রতিশম বিক্রি করেন। সকল হতাশার অবসান ঘটান,জীবনে হাজারো দুঃখ কষ্টের পর ও একজন রব্ব আছেন এই বিশ্বাস নিয়েই সকল মানুষ আশায় বুক বাধে।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাকে নানান সময় নানা রকম পরিক্ষা,নানা রকম বিপদ দিয়ে থাকেন।যেগুলো রব্বে কারীম আমাদের ঈমানের পরীক্ষা করার জন্য দেন।যার ঈমান যতো প্রখর তার পরীক্ষা ততো কঠিন।পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদারের ঈমান বৃদ্ধি পায় আর বেইমান পরীক্ষার মাধ্যমে আরো রব্বের অবাধ্যতায় নিপতিত হয়।আলাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

অর্থাৎ,অচিরেই আল্লাহ স্বীয় সান্নিধ্য থেকে বিজয় আনয়ন করবেন,অথবা কোনো আদেশ প্রেরণ করবেন।

[সূরা মায়িদাহ ৫২ নং আয়াত]

সুতরাং ,ক্ষুধার্ত উদর পরিতৃপ্ত হবে খাদ্যে, পিপাসার্ত প্রাণের পিপাসা নিবারিত হবে,রাত গিয়ে দিন আসবে,সকল আধার দূরীভূত হবে,রোগা শরীর নিরোগ হবে,হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে

আসবে,পথহারা পথিক পথের দিশা পাবে,বন্দী বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে,সকল আধার ঘুচিয়ে যাবে রব্বে কারীমের দয়ায়,তার অনুগ্রহে। তিনি ব্যতীত কোনো অবিভাবক নেই,কোনো সাহায্যকারী নেই।

তিনি ই রব্ব যিনি আমাদের বিপদে ফেলেন,হতাশায় নিমজ্জিত করেন আর তিনিই আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।রাত্রিকে জানিয়ে দিন সুবহে সাদিক নিকটে চলে এসেছে,চিন্তাগ্রস্তকে সুসংবাদ দিন অচিরেই তার মনের আকাশ থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ দূরীভূত হবে,বিপদগ্রস্তের বিপদ ও খুব শীঘ্রই ঘুচিয়ে আশার সূর্য উদিত হবে,সেই রব্বের দয়ায় শীঘ্রই বিরহ,বেদনা দূর হয়ে খুশির হিল্লোল বয়ে উঠবে,ইব্রাহীম (আ:) এর আগুন ও সেই রব্বের দয়ায় ফুলের বাগানে পরিণত হয়েছে,মূসা (আ:) কে সমুদ্র নিমজ্জিত করতে পারে নি সেই রব্বের দয়ায়,তেমনি তিমি ও রব্বের প্রিয় ইউনুসকে হজম করতে পারে নি।আর রব্বের প্রিয় বান্দাদের রব্ব এভাবেই সকল মসিবতে হেফাজত করেছেন।

যুগে যুগে যারাই রব্বে কারীমের প্রিয় হয়েছেন রব্ব তাদের ক্ষনিকের জিন্দেগী তে অনেক বিপদ,আপদ,মসিবতে নিপতিত করেছেন তাদের ঈমানের পরিক্ষা নেয়ার জন্য পরক্ষনেই মহান রব্ব তাদের অপরিমিত নেয়ামতে ভূষিত করেছেন।সেই বিপদে তিনিই তাদের পথ দেখিয়েছেন।তাই জীবনের যেকোনো বিপদে,আপদে,মসিবতে মহান রব্বের একাগ্রতা থাকলে সকল বিপদ আপদ আমাদের জন্য নেয়ামতে রুপ নিবে।

সকল পরিস্থিতিতে রব্বে কারীমের উপর তাওয়াক্কুল করলে পাহাড় সমান সমস্যা,সাগরের পানির পরিমাণ মসিবত ও তিনি এক মূহুর্তে উধাও করে দিতে পারেন।তাই আমরা কখনো নিরাশ হবো না,প্রতিকুল পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়বো না সকল পরিস্থিতিতে মনকে এটা বলে জানান দিবো,

“নিশ্চয়ই কষ্টের মাঝেই রয়েছে স্বস্তি”

জ্ঞানী মানুষ বিপদকে সম্পদে পরিণত করে,দুঃখকে সুখে বদলে দেয়,লোকসানকে লাভে রুপান্তরিত করে।আর পক্ষান্তরে অজ্ঞ ব্যক্তি সামান্য বিপদেই হাল ছেড়ে দেয়,বিপদ দেখলেই হায় হুতাশ শুরু করে।বুদ্ধি থাকলে টক লেবু দিয়েও মিষ্টি শরবত বানিয়ে খাওয়া সম্ভব আর অজ্ঞ হলে ভালো জিনিসও কোন খাতে ব্যয় করলে উত্তম হবে তা না জানার কারণে তা অপচয় হয়ে যায়।সকল কিছুর ই ভালো খারাপ দুইটি দিক থাকে আমাদের উচিৎ সবসময় ভালো দিকটা খুজে বের করা।

দুনিয়ার চিন্তা মাথায় না নেয়াই প্রকৃত সুখ

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা ছোট্ট মাথায় পুরো দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুরে,তারা থাকে নিজের ঘরে কিন্তু স্ত্রা দুনিয়া নিয়ে তাদের ভাবনা।কোথায় কার কি হলো,কোন দেশের কি

সমস্যা তারা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকে।ছোট্ট একটা মানুষ হয়ে গোটা পৃথিবী টাকে তারা মাথায় নিয়ে ঘুরতে চায়।বৃষ্টি কেন আসলো,এতো শীত কেন,কোন দেশ বিশ্বকাপে হেরেছে,কোন দেশ বিশ্বকাপে জিতেছে,কোন অভিনেতা,অভিনেত্রীর কি হয়েছে,তাদের মাথায় সবসময় এগুলো ঘুরপাক খায়।তারা সবসময় একটা হতাশা,আর উদ্বিগ্নতায় ভোগে।তাদের মনের ভিতর কেমন যেনো একটা অস্বস্তি থাকে সবসময়,যে কোনো শোরগোল শুনলে তারা মনে করে,তা তাদেরই বিরুদ্ধে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের উচিৎ নিজের ভাবনা ভাবা,নিজের আখিরাত গোছানো।দুনিয়ার অন্য মানুষদের জন্য ফিকির করতে করতে আমরা নিজেদের কথাই ভুলে যাই।নিজের আমল,এখলাসের দিকে বেখবর হয়ে পড়ি।বিশ্বের খবরাখবর বিশ্বেই পড়ে থাকুক,তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের জীবনের মহা মূল্যবান সময় গুলো আমাদের এভাবে অপচয় করা উচিৎ না।

যদি আমরা সুখী ও সুন্দর জীবন চাই তাহলে সকল রকমের অযথা চিন্তা থেকে,কুড়োনো হতাশা থেকে আমাদের দূরে সরে থাকতে হবে।যাদের নিয়ে আমাদের কোনো লাভ,লস নেই তাদের ভাবনা জীবন থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে হবে।জীবনের মোড় পরিবর্তন করে ফেলতে হবে।জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে আত্মকেন্দ্রিক। তাহলেই আমরা জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারবো।তাহলেই জীবনের আসল সুখ আমরা আস্বাদন করতে পারবো ইনশা আল্লাহ।

তুচ্ছ বিষয়ে না জড়ানো

আমাদের অনেকেরই স্বভাবগত অভ্যাস যে আমরা তুচ্ছ জিনিসকে অনেক বড়ভাবে উপস্থাপন করি,তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অনেক মাথা ঘামাই।যেই জিনিস টাকে সহজেই মিমাংসা করে ফেলা যেতো সেই সামান্য বিষয় টাকে অনেক বড় করে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলি। পক্ষান্তরে অনেক বড় বড় বিষয়কে ছোট করে দেখি।সেগুলো কে পাত্তাই দেই না

যেমন,মুনাফিকরা কতো ছোট মন মানসিকতার যে জিহাদের দিকে তাদের আহবান করা হলে তারা নানা অজুহাত,ওযর-আপত্তি দেখাতো।কোনো না কোনো অজুহাত তাদের লেগেই থাকতো যার মূল কারণ ছিলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা।তারা কখনো কখনো বলতেন,"তোমরা এ গরমে বের হয়ো না",কখনো বলতেন,"আমাদের বাড়ি ঘর অরক্ষিত",কখনো বা বলতেন,"আমাদে্র আশঙ্কা হয় যে,আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে"আবার কখনো বা বলতেন,"আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি তো প্রতারণা বৈ আর কিছু নয়"আরো অনেক নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট চিন্তাধারা ছিলো তাদের।তাদের কাছে দুনিয়ার গাড়ি,বাড়ি,ধন,সম্পদ,সন্তান,সন্তানাদি,যশ,খ্যাতি এগুলো ই ছিলো সব।তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিতো।

আমাদের সমাজেও কিছু লোক আছে যারা ক্ষনস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে।তারা আখিরাতকে তুচ্ছজ্ঞান করে দুনিয়ার খেল তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।চিরস্থায়ী আখিরাত নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই কিন্তু মশার ডানার মতো জীবন নিয়ে তাদের কতো ফিকির।তারা সবসময় তুচ্ছ জিনিস গুলো কে অনেক বিশালভাবে দেখেন আর অনেক বড় বিষয়কে ও পাত্তা দিতে চায় না।আর জীবনে প্রকৃত সুখ খুজে না পাওয়ার এটা ও একটা কারণ।জীবনে সুখী হতে হলে তুচ্ছ বিষয় গুলো তুচ্ছজ্ঞান করতে জানতে হবে।যার সম্মান যতোটুকু তাকে ততোটুকুই দিতে হবে,বেশিও না আবার কম ও না।

আমরা সবাই সুখী হতে চাই

মানুষ প্রকৃতগতভাবে সুখান্বেষী। সুখী হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই তার পথচলা। সুখ কোনো দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। এটা নিতান্তই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়। মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম, উচিত-অনুচিত, আনন্দ-নিরানন্দ পরিমাপ করার একটা মানদন্ড আছে। এই মানদন্ড ইন্দিয়ানুভূতি সৃষ্টি করে। এই ইন্দিয়ানুভূতিতে যা কিছুই ইতিবাচক হিসেবে প্রতিফলিত হয় এবং যা উপকারী ও আনন্দদায়ক, তাই সুখের উৎস। যেমন- ভালো কাজ বা পুণ্যকর্ম মানুষের মধ্যে সুখানুভূতি সৃষ্টি করে, যা মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। এই মানসিক প্রশান্তিই সুখ।

সুখের উৎস অসংখ্য। ঘর বাঁধায় সুখ, উত্তম স্ত্রীতে সুখ, ভালো সন্তানে সুখ, বিত্তবৈভবে সুখ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে সুখ, কারো কল্যাণে বা সেবায় সুখ, সৎ জীবনযাপনে সুখ, ক্ষমতায় সুখ, কারো আনুগত্যে সুখ, নিরাপত্তায় সুখ, শান্তিতে সুখ- এ রকম আরো নানা বিষয়ে সুখ বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে আছে, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে। এটাই সুখ। পবিত্র হাদিসে আছে, সকল পুণ্যকর্ম শান্তি এনে দেয়। এই অনুভবই সুখ।

প্রশ্ন হলো, সুখ কি সবাই পায়? সুখের উৎস ও উপাদানগুলো কি সবাইকে সমান সুখী করতে পারে? এর উত্তর নিশ্চিত নয়। একজন মানুষ হয়তো বিত্ত-সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট। অন্যরা তা নয়। অন্য কেউ হয়তো কষ্টের সঙ্গে জীবনযাপনে সন্তুষ্ট। কেউ বা আবার দারিদ্র্যেও সন্তুষ্ট। যেমন- কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান। তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।’

সুখী হওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্তে¡ও কেউ সুখী হয়, কেউ বা হয় না। অন্য এক কবির ভাষায়- ‘সদায় সুখ সুখ করি আমি, সুখতো আমার হলো না।’ মধ্যযুগীয় এক কবি বলেছেন, ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল, অমিয়া সাগরে সিনন করিতে সকলি গরল ভেল।’ সুখসন্ধানী অনেকের ভাগ্যেই সুখের দেখা মেলে না। সুখের ঘর আগুনে পুড়ে যাওয়ার কিংবা সুখসাগর গরলে পরিণত হওয়ার নজিরও আমাদের সামনে ভূরি ভূরি। এই তো ক’দিন আগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের একজন ডাক্তারের ঘরই শুধু পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি, তার জীবনও

চলে গেছে। তিনি আত্মহত্যা করে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দীর্ঘ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বিয়ে করা স্ত্রীর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরকীয়ার অভিযোগ ছিল তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই স্ত্রী এখন জেলে। তার জীবনও বিষময়। সমাজে এ ধরনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, সন্তান পিতা বা মাতাকে, পিতামাতা সন্তানকে এবং ভাই ভাইকে অবলীলায় হত্যা করছে। ধর্ষণের রীতিমতো উৎসব চলছে। মাদকের তান্ডব ও আগ্রাসন সর্বত্র। জানমালের নিরাপত্তা কোথাও নেই। এ অবস্থায় কোথায় সুখের সন্ধান মিলবে? ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এক গভীর অসুখে আক্রান্ত।

দেশে সুখ যে দিনে দিনে উঠে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট-১৮তে তার প্রমাণ রয়েছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫। ২০১৭ সালে ছিল ১১০। অর্থাৎ এক বছরে ৫ ধাপ অবনমন ঘটেছে।

রিপোর্টে সুখের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়েছে- জিডিপি, সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, দাতব্য সেবা ও দুর্নীতিহীনতাকে। রিপোর্টে দেখা গেছে, যেসব দেশে বৈষম্য ও ভেদাভেদ কম ও সহায়তা বেশি, সেসব দেশের মানুষই সুখী।

ইসলাম বলে, সুখের ভিত্তি বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা, কৃতজ্ঞতা, ব্যাপক রিজিক ও ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, তৃপ্তি ও আশাবাদিতা। জীবনে যা পাওয়া গেছে তা নিয়ে ইতিবাচক ভাবনা, যা পাওয়া যায়নি তা নিয়ে না ভাবা। সব সময় নিজের চেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীকে দেখা, বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরিবার ও শ্রেণীকে না দেখা। এভাবে চললে মন বিচলিত ও নিক্ষিপ্ত হওয়ার বদলে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হবে।

সেজন্যই বলা হয়, ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, ‘আমি তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি ও তার মধ্যে রিজিকের ব্যবস্থাও করেছি। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।’ সূরা আরাফ : আয়াত ১০। রাসূল সা: বলেছেন, প্রকৃত সুখ ও ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তরের সুখ ও ঐশ্বর্য।

তিনি আরো বলেন, মানুষকে যত নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কৃতজ্ঞ অন্তর। তিনি এও বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মদ সা:-কে নবী হিসেবে কবুল করে নিয়েছে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানের সম্পদ লাভ করেছে। বস্তুত ঈমানই সুখের চাবিকাঠি। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমানদার হওয়ার সুযোগ দিয়ে সুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন, এই কামনা করি।

যে পথে চললে সুখ পাওয়া যায় সে পথে কম লোকই চলে। সুখের পথ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় নিয়ে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের প্রধান বিষয় বানায় না, সে অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে।

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

“আমি অচিরেই তাদেরকে ক্রমে ক্রমে শাস্তি দিয়ে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলব যে তারা টেরও পাবে না।” (৭-সূরা আল আ’রাফঃ আয়াত-১৮২)

২. সুখ লাভের আশায় মানুষেরা বিভিন্ন জটিল ও চাতুরীপূর্ণ পথ অনুসরণ করে। তারা খুব কমই জানে যে, ইসলাম ধর্মে তাদের জন্য একটি সহজতর পথ প্রস্তুত করাই আছে। সে পথ তাদের জন্য সর্বোত্তম ইহজীবন ও পরকাল বয়ে আনবে।

لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

“কিন্তু তোমাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল যদি তারা তা (অনুসারে কাজ) করত তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য ভালো হতো এবং (চিত্তের) স্থিরতার জন্য তা দৃঢ়তর হতো।” (৪-সূরা আন নিসাঃ আয়াত-৬৬)

৩. এ পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা মনে করে যে, তারা ভালো কাজ করছে। কিন্তু আসলে তারা ইহজীবনে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা সত্য ধর্মকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

“আর সত্য সত্যই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণ হয়েছে।” (৬-সূরা আল আন’আমঃ আয়াত-১১৫)

সুখ ও সফলতার রহস্য

পৃথিবীতে সবাই সুখ ও সফলতা প্রত্যাশা করে। এখানে মানুষের চাহিদা অসীম কিন্তু চাহিদা পূরণের সময় ও সম্পদ সীমিত। তাই যে ব্যক্তি এখানে চাহিদা সীমিত করতে সক্ষম হবে সেই সুখী হবে এবং সফলতার স্বাদ পাবে। চাহিদা পূরণের জায়গা তো পরকাল; সেখানে মানুষ যা চাইবে তাই পাবে। তাই পৃথিবীতে অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন ছাড়া সুখ ও সফলতা কল্পনা করা যায় না। অল্পে তুষ্টিকে আরবিতে ‘কানাআত’ বলা হয়। এটি মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। অল্পে তুষ্টি মানে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

জাগতিক যত বিষয় আছে, তাতে কানাআত বা অল্পে তুষ্টিতে মুমিনের প্রকৃত সফলতা নিহিত রয়েছে। অল্পে তুষ্টির বিপরীত হলো লোভ ও মোহ। বেশি উপার্জন করতে হবে, বেশি থেকে বেশি পেতে হবে, আমাকে ধন-সম্পদ বাড়াতেই হবে, আসবাবপত্র বাড়াতেই থাকতে হবে এমনটির চাহিদা মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ একটি স্বাভাবিক বিষয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, ‘নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।’ (সুরা আলে ইমরান : ১৪)।

নিজের সম্পদ কম-বেশি যতটুকুই হোক তাতেই যারা তৃপ্ত, দুনিয়ার জীবন তাদের জন্য হয়ে ওঠে অনেক বেশি সুখকর। হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) আপন ছেলেকে এ বলে উপদেশ দিয়েছিলেন 'বাবা শোন! যখন কোনো কিছু তালাশ করবে তখন অল্পে তুষ্টি সঙ্গে নিয়ে তালাশ করবে। আর তোমার যদি অল্পে তুষ্টি না থাকে তা হলে কোনো সম্পদই তোমার কাজে আসবে না।'(আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ১১১০)

সুখী থাকবেন কিভাবে? হাদিসে যা বলা হয়েছে

সুখী হতে চান না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। সুখের খোঁজে, উৎসবের আয়োজন করতে করতেই কেটে যায় জীবনের পুরো সময়কাল। একটু সুখ, ভালো থাকার আশায় দিনের শুরু থেকে রাত পর্যন্ত কেটে যায় কঠোর পরিশ্রমে। এরপরও মনে হয় কাঙ্খিত সুখ আর একটু প্রশান্তির দেখা মিললো না এখনো।

মানুষের স্বভাবের এই অতৃপ্তির বিষয়টি নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আদম সন্তানের দুই উপত্যকা ভরা সম্পদ থাকে, তবু সে তৃতীয়টার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর মাটি ছাড়া আদম সন্তানের পেট কিছুতেই ভরবে না। আর যে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৩৬)

প্রতি মুহূর্তে মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্খার মাত্রা যে বাড়তে থাকে এই হাদিসে মূলত তাই বলা হয়েছে। মানুষ সুখী থাকতে চায়, সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু এমন অফুরন্ত চাওয়া-পাওয়া আর প্রত্যাশাই তাকে অশান্ত-অসুখী করে তোলে।

মানুষকে এমন অপ্রাপ্তির অশান্তি থেকে মুক্ত করতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, যাকে প্রয়োজন মাফিক রিজিক প্রদান করা হয়েছে এবং যে তাতেই পরিতুষ্ট থাকে, সে-ই সফলকাম হয়েছে। -(ইবনে মাজাহ, হাদিস ৪১৩৮)

তাই অধিকপ্রাপ্তি ও আকাঙ্খা ছেড়ে অল্পেতুষ্ট হতে চেষ্টা করা উচিত সব মানুষের। কারণ, মানুষের প্রতিটি কাজের প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। মানুষের কোনও কষ্ট-পরিশ্রম কখনো বৃথা যাবে না।

পবিত্র কোরআনেই আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে শান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছেন। বর্ণিত হয়েছে, 'যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমি তাদের তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব। (সুরা : নাহাল, আয়াত : ৯৭)

অল্পেতুষ্টি একটি মহৎগুণ। এই গুণ অর্জনে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দোআ করতেন, 'হে আল্লাহ আমাকে যা রিজিক দিয়েছেন

তাতে তুষ্ট করে দিন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দিন আর আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজ হয় তা ভালভাবে শোধ করুন।' (মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৩৫৬)

আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন এতেই তুষ্ট থেকে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কারণ, যার মধ্যে শুকরিয়া নেই এবং যা কিছু পেয়েছে তাতে যে মানসিকভাবে তুষ্ট হতে পারে না, তার চেয়ে দরিদ্র আর কেউ নয়।কারণ, মানুষের আর্থিক দরিদ্রতাই শুধু দরিদ্রতা নয়; বরং সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা হলো, মানুষের মনের দরিদ্রতা।একদিন হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরত আবু জর (রা.)-কে বলেন, আবু জর, তুমি কি সম্পদের প্রাচুর্যকেই সচ্ছলতা মনে করো? আবু জর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরপর বলেন, তাহলে তুমি সম্পদের স্বল্পতাকে দারিদ্র্য মনে করো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আসলে সচ্ছলতা তো হৃদয়ের সচ্ছলতাই, আর হৃদয়ের দারিদ্র্যই আসল দারিদ্র্য। (ইবনে হিব্বান : ৬৮৫)

সদা হাস্যমুখ রাখা

শত দুঃখের মাঝেও একটু হাসি মুখে থাকার চেষ্টা করা উচিৎ আমাদের।সবসময় চেহারার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা রাখা। মুচকি হাসি দিয়ে আমাদের উচিৎ মুসলিম ভাই তথা আত্বীয় স্বজনের মন জয় করা।শত কাটার মাঝে ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর ও প্রানবন্ত থাকা।

সদকা শুধু সম্পদ বিসর্জন বা অন্যকে খাদ্য খাওয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমেও সদকা করা যায়। এর মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি তৈরি হয়।

হাসিমুখে কথা বলা

মানুষকে আনন্দিত করার একটি বিশেষ উপায় হলো ছোট-বড়-নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'প্রতিটি ভালো কাজ সদকাস্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেওয়াও নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত।প্রতিটি কাজ ই তার নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে,আপনি নেক নিয়্যাতে আপনার আত্মীয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বললে তাও আপনার নাজাতের উসিলা হবে।কখনো কারো সাথে খারাপ আচরণ না করা,রাগ হয়ে কথা না বলা,অন্যের মনে কষ্ট যায় এমন কোনো কাজ করা আমাদের জন্য সমীচীন না।

হাসিমুখে কথা বলা একটি ভালো কাজ,যা ইসলামিক দৃষ্টিতে 'সদকা' বা দানের সমতুল্য। এটি সম্পর্কের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ায়, হিংসা ও বিভেদ দূর করে এবং মানুষকে আনন্দ ও প্রশান্তি দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তুমি কোন ভাল আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না, যদিও সেই আমলটি হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা"।

হাসিমুখে কথা বলার গুরুত্ব:

- **সদকা বা দান:** হাসিমুখে কথা বলাকে 'সদকা' বলা হয়, যা মানুষকে আনন্দ ও শান্তি দান করে।হাসিমুখে কারো সাথে কথা বললে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়,সবাই পারে না হাসি মুখে অন্যের সাথে কথা বলতে।এটাও একটা ইবাদাত। যার দ্বারা অন্যের মন জয় করা যায়।অন্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।
- **সম্পর্কের উন্নয়ন:** এটি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন শক্তিশালী করে এবং হিংসা ও বিভেদ দূর করে।অন্যের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়,আর সম্পর্কের উন্নতি হলে বিভিন্ন বিপদ,আপদ,মসিবতে অন্যের থেকে সাহায্য,সহযোগিতা পাওয়া যায়।ভ্রাতৃত্ববন্ধন যতো দৃঢ় হবে পৃথিবী ততো সুন্দর আর উন্নত হবে।তাই আমাদের উচিৎ নিজেদের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন করা,অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা।
- **সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক:** হাসি সৌভাগ্যের প্রতীক এবং এটি মানুষের মন জয় করার একটি সহজ উপায়।হাসি মুখে মানুষ বিশ্বকে জয় করতে পারে।একজন হাসিখুশি মানুষ সকল প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।তিনি তার মনোভাবের জন্য জীবনে সাফল্যের চূড়ায় অগ্রসর হতে পারে।
- **ক্ষমা ও উদারতা:** এটি সীমাহীন ক্রোধ ও সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে।ক্ষমা একটি মহৎ গুণ,এটি মানুষ কে আত্মিক প্রশান্তি দান করে।মানুষের অন্তর থেকে কুপ্রবৃত্তি দূর করে।অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে।তাই ক্ষমা ও উদারতার প্রতীক আমাদের অন্তরে লালন করা জরুরী।
- **ইবাদত:** এটি ইবাদতের একটি অংশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।হাসি মুখে কথা বলাও এক ধরনের ইবাদাত।এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়,আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।যখন দুনিয়াবাসী আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ও আমরা প্রিয় বান্দা হিসেবে গন্য হতে পারবো।

হাসিমুখে কথা বলার সুফল: হাসি মুখে অন্যের সাথে কথা বলার ফলে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।একজন ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি কখনো কারো প্রিয় হতে পারে না।তার স্বভাবের জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না।সকলের কাছে সে ঘৃণিত। আর হাসিখুশি থাকা একজন মানুষ পৃথিবী বাসীর কাছে সবসময় মুকুট হয়ে থাকে।তাকে সবাই সম্মান করে,তার উপর সবাই সন্তুষ্ট থাকে।অপরদিকে একজন ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি সকলের চোখের বালি হয়ে থাকে,তাকে কেউ পছন্দ করেনা,সবাই তাকে অপছন্দ করে সে কারো প্রিয় হয়ে পারে না।হাসি মুখে কথা বললে অন্তর থেকে অহংকার দূর হয়,অন্তরে সুকুন মিলে।সামাজিক সম্প্রীতি দূর হয়।অহংকার ,হিংসা,ঘৃণা থেকে বেচে থাকা যায়।

মানুষের সাথে সদব্যবহার করা

হাদিসে এসেছে, ‘তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো’ (মুসলিম শরিফ, হাদিস: ৭৩)। অন্যকে সালাম দেওয়া মানে তার শান্তি কামনা করা। এখানে ছোট বড়কে, কালো ফর্সাকে, গরিব ধনীকে সালাম দেবে—এমন কথা বলা হয়নি; বরং সবাই সবাইকে সালাম দেবে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

মানুষের সঙ্গে বসবাস, চলাফেরা ও সদ্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী (সা.) বলেন, ‘যে মুসলমান সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের থেকে পাওয়া বেদনাদায়ক বিষয়াবলির ওপর ধৈর্য ধারণ করে, সে ওই মুসলমান থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ যে একাকী জীবনযাপন করে এবং মানুষের বেদনাদায়ক কথায় ধৈর্য ধারণ করে না।’ (তিরমিজি শরিফ, হাদিস: ২৫০৭)।

তিনি আরও বলেন, ‘মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।’ (আল মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি, হাদিস: ২৯৮)। মহানবী (সা.) বলেন, নিজের মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্য সদকাস্বরূপ।’ (তিরমিজি শরিফ, হাদিস: ১৯৫৬)।

ইসলামে বিশেষত মা-বাবার সঙ্গে সদাচার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পৃথিবীতে আগমনের প্রকাশ্য মাধ্যম তারা। এজন্য ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতায় বাবা-মায়ের মর্যাদা ও সম্মানের মহত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনে একাধিক নির্দেশনা এসেছে।

রাসুল (সা.) বলেছেন, বাবা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী দরজা। (আল মুসতাদরাক আলাস-সাহিহাইন, হাদিস: ২৭৯৯)। তিনি আরও বলেন, বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি শরিফ, হাদিস: ১৮৯৯)

বড়দের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে নওজোয়ান কোনও বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়সের কারণে সম্মান করবে, আল্লাহতায়ালা তার বার্ধক্যেও এমন মানুষ তৈরি করে দেবেন, যে তাকে সম্মান করবে ও তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। (তিরমিজি শরিফ, হাদিস: ২০২২)।

রাসুল (সা.) অন্যত্র ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করে না, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। (তিরমিজি শরিফ, হাদিস: ১৯১৯)।

প্রতিবেশী ও স্বজনদের খেয়াল রাখা এবং তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসুল (সা.) বলেন, সে তো মুমিনই নয়, যে নিজে পেটপুরে খেলো কিন্তু তার প্রতিবেশী অভুক্ত রইলো। (আল মুসতাদরাক আলাস-সাহিহাইন, হাদিস: ৭৩০৭)।

আল্লাহর রাসুল আরও বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী হলো ওই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিবেশীর কাছে উত্তম। (সহি ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৫১৮)।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা সদাচারের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এর বিপরীত; অর্থাৎ অসাদাচরণের শামিল। যারা বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, ইসলামে তাদের কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

রাসুল (সা.) বলেন, 'সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি শরিফ, হাদিস: ৫৯৮৪)।

সমাজ সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহারের ওপর টিকে থাকে। আর এগুলোর মূল উপাদান যখন অনুপস্থিত থাকে, তখন সমাজে ফাটল দেখা দেয়। ভালোবাসা ও সদ্ব্যবহারের শক্তিশালী উপাদান হলো আত্মত্যাগ ও কোরবানি। এজন্য পবিত্র কোরআনে আত্মত্যাগের প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, '...আর তারা (আনসাররা) তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিররা) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন।...' (সুরা হাশর, আয়াত: ৯)। এটি প্রাচীন ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম সমাজের ওইসব গুণাবলির ছোট্ট একটি গুণ, যেটি সেই সোনালি সমাজের অংশ ছিল। এ কারণেই অপরিচিত দুটি দল; আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং আমাদেরও উচিত সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা—এতে ইসলামি জীবনাদর্শ পরিপালনের জন্য যেমন আমরা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবো, তেমনি দুনিয়ায় আল্লাহ আমাদের সম্মানের মতো মহাদৌলত দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা

পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মায়াজাল মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের আবহ সৃষ্টি করে। খাঁটি অলঙ্কারের চেয়ে খাঁটি বন্ধুর মূল্য অনেক বেশি। কারণ অলঙ্কারের বাস শরীরে, মনের মধ্যে নয়। কিন্তু একজন ভালো বন্ধু বাস করে মনের মধ্যে, চেতনার গহীনে। বন্ধুতো বানাতে হবে; তাই বলে যাকে-তাকে বন্ধু বানানো যায় না। কারণ জীবনে বন্ধুর প্রভাব পড়ে। ভালো বন্ধু একজন খারাপ মানুষকে ভালো বানাতে সাহায্য করতে পারে, পক্ষান্তরে খারাপ বন্ধু একজন ভালো মানুষকে নিয়ে যেতে পারে অধঃপতনের অতল তলে। বন্ধুত্ব তৈরির আগে অবশ্যই যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক।

মানবজীবনে আদর্শ বন্ধু নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' (সুরা আলে ইমরান : ২)। আল্লাহপাক আরও ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।'

(সুরা তাওবা : ১১৯)।

আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফু দানকারী

(কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুঁ দানকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।**সহীহ] - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।] - [সহীহ মুসলিম - 2628]**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শ্রেণির লোকের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন:

প্রথম প্রকার: উত্তম বন্ধু ও সহচর, যে আল্লাহ এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ দেখায় এবং আনুগত্যের কাজে সাহায্য করে। সে একজন কস্তুরী বিক্রেতার মত, হয় সে আপনাকে তার থেকে কিছুটা দেবে অথবা আপনি তার কাছ থেকে কিনবেন অথবা আপনি তার কাছ থেকে একটি সুন্দর ঘ্রাণ পাবেন।

দ্বিতীয় প্রকার: খারাপ বন্ধু এবং সহচর। যে মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং পাপ কাজে সাহায্য করে। আপনি তার কাছ থেকে কুৎসিত কাজ দেখতে পাবেন এবং আপনি তার মত কাউকে সঙ্গ দেওয়া এবং তার সাথে বসার জন্য নিন্দিত হবেন। সে একজন কামারের মত যে তার আগুনে ফুঁক দেয়। হয় সে তার উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ থেকে আপনার জামা-কাপড় পুড়িয়ে দেবে, অথবা আপনি তার কাছ থেকে খারাপ গন্ধ পাবেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে সৎসঙ্গীকে আতরওয়ালার সঙ্গে এবং অসৎসঙ্গীকে কামারের সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হচ্ছে মানুষের জীবনে ভালোমন্দ সঙ্গীর কিছু না কিছু প্রভাব পড়েই। তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। কাজেই প্রত্যেকের কর্তব্য ভালো সঙ্গী গ্রহণ করা, ভালো লোকের সঙ্গে উঠাবসা করা ও উত্তম সাহচর্য গ্রহণে সচেষ্ট থাকা। সৎ সঙ্গ দ্বারা মন্দ লোকও ভালো হয়ে যায়। আবার মন্দ লোকের সঙ্গে চলাফেরার কারণে ভালো লোকও নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিজ্ঞজনেরা বলেন, সর্বদা সৎলোকের সাহচর্যে থাকা চাই। আওলিয়া ও বুযুর্গানে দীনের সাহচর্য গ্রহণকারী কখনও তাদের কল্যাণ ও বরকত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না। হযরত আলী রাযি. বলেন, পাপিষ্ঠের সঙ্গে চলবে না। সে তার মন্দ কাজকে তোমার কাছে আকর্ষণীয় করে দেখাবে। তার একান্ত কামনা থাকবে তুমিও যেন তার মত হয়ে যাও।

বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন, সাবধান! মন্দ লোকের সঙ্গে উঠাবসা করো না। কেননা তোমার স্বভাব-প্রকৃতি তোমার অজ্ঞাতসারেই তাদের খাসলাত থেকে চুরি করবে। এক সঙ্গীর উপর অন্য সঙ্গীর আছর কেবল কথা ও কাজ দ্বারাই নয়, চোখের দৃষ্টি দ্বারাও পড়ে থাকে এবং তা পড়ে থাকে কিছুক্ষণ পাশাপাশি থাকার দ্বারাও। হাসিখুশি লোকের দিকে তাকালে মনের মধ্যে খুশির হাওয়া বয়ে যায়। আবার বিষণ্ন ও দুঃখীর দিকে তাকালে মনে বিষাদ ছড়িয়ে যায়। সঙ্গ-সংস্পর্শের এ প্রভাব কেবল মানুষের বেলায়ই নয়; পশু পক্ষী, গাছপালা ও আলো-বাতাসের মধ্যেও তা লক্ষ করা যায়। এটা তো একটা চাক্ষুষ বিষয় যে, ময়লা-আবর্জনার

স্পর্শে জলবায়ু দূষিত হয়ে যায়। পুষ্পোদ্যানের উপর দিয়ে বয়ে চলা বাতাস সুরভিত হয়ে ওঠে।

যাহোক এ হাদীছ মূলত মন্দ সাহচর্য পরিহার করে ভালো সাহচর্য অবলম্বনের উৎসাহ যোগায়। ভালো সাহচর্য বলতে এমন ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করা, যার সাহচর্য দ্বারা অন্তরে আল্লাহভীতি সঞ্চার হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, আমল-আখলাকে পরিবর্তন আসে। সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ আমাদের পক্ষে ভালো? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন-

من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله

'যার দিকে তাকালে সে তাকানো তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথা তোমাদের ইলম বৃদ্ধি করে এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।২৩৮

যাদের সঙ্গে চলাফেরার দ্বারা নিজ আমল-আখলাকে উন্নতির সম্ভাবনা নেই; বরং ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাদেরকে এড়িয়ে চলাই ভালো। বরং ক্ষতিকর সাথী-সঙ্গী অপেক্ষা একা চলাই উত্তম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة

'মন্দ সঙ্গী-সাথী অপেক্ষা একাকিত্বই শ্রেয়। আর একাকিত্ব অপেক্ষা সৎসঙ্গী উত্তম।২৩৯

হাদীস থেকে শিক্ষণীয়ঃ

ক. সুহবাত ও সাহচর্যের অবশ্যই আছর আছে। তাই সাহচর্য অবলম্বনে সতর্কতা জরুরি।

খ. নিজের দীন ও ঈমান এবং আমল ও আখলাকের হেফাজতকল্পে প্রত্যেকের কর্তব্য কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে কাটানো এবং সর্বদা সৎলোকের সঙ্গে চলাফেরা করা।

গ. কিছুতেই মন্দ লোকের সঙ্গে উঠাবসা করা উচিত নয়।

ঘ. নিজ বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিতে পারলে তাতে বক্তব্যের বিষয়বস্তু অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

২৩৮. মুসনাদ আবূ ইয়া'লা মাওসিলী, হাদীছ নং ২৪৩৭; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীছ নং ৯০০০; খারাইতী, মাকারিমুল আখলাক, হাদীছ নং ৭৩৫

২৩৯. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীছ নং ৪৬৩৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীছ নং ৩৪৮১৯; খারাইতী, মাকারিমুল আখলাক, হাদীছ নং ৭৫৩

বিনয়ী হওয়া

বিনয়ী হওয়ার মানে হলো অহংকার ও ঔদ্ধত্য পরিহার করে কোমল ও নম্র আচরণ করা এবং অন্যের কাছ থেকে শিখতে আগ্রহী থাকা
। এটি একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সমাজে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে।
কীভাবে বিনয়ী হবেন

- অহংকার ত্যাগ করুন: নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখুন এবং নিজের অর্জনের কথা বিনয়ের সাথে প্রকাশ করুন।
- মিথ্যা এড়িয়ে চলুন: সবসময় সত্য কথা বলুন।
- অহংকার না করে শিখুন: জ্ঞান বা পদমর্যাদায় ছোট কারো কাছ থেকেও কিছু শেখার মানসিকতা রাখুন।
- ভুল স্বীকার করুন: নিজের ভুল হলে তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করুন।
- সহানুভূতিশীল হোন: অন্যের দুঃখ ও কষ্ট বোঝার চেষ্টা করুন এবং সাহায্য করার ইচ্ছা রাখুন।

বিনয়ী হওয়ার উপকারিতা

- মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে এবং আপনার সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করবে।
- অহংকারমুক্ত ও সরল জীবনযাপন করতে পারবেন।
- আপনি অন্যদের কাছ থেকে শিখতে পারবেন এবং নিজেকে আরও উন্নত করতে পারবেন।
- এটি একটি শক্তিশালী চারিত্রিক গুণ, যা আপনাকে দুর্বল করে না বরং শক্তিশালী করে তোলে।
- ইসলাম অনুযায়ী, বিনয়ী হলে আল্লাহ আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

- দুনিয়ায় দাসত্বের গুণ যে যতটা বেশি হাসিল করতে পারবে, মহান প্রভুর সামনে সে নিজেকে ততটাই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করবে। নিজেকে এভাবে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করার নামই বিনয়। বান্দা খাঁটি মনে বিশ্বাস করবে, আমার যা কৃতিত্ব এর কিছুই আসলে আমার নয়, এসবই আমার প্রতি আমার আল্লাহর দান। আমার যা সম্পদ এগুলো আসলে কিছুই আমার অর্জন নয়, সবই আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। দুনিয়াতে প্রাপ্ত সবকিছুকেই যখন আল্লাহর নিআমত হিসেবে কেউ মেনে নেবে, তখন অনিবার্যভাবেই সে হয়ে উঠবে কৃতজ্ঞ ও বিনয়ী। আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগিতে যখন বিনয় ও কৃতজ্ঞতার পরশ থাকবে, সকল প্রাপ্তিকেই যখন সে কেবলই আল্লাহর দান বলে মেনে নেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে মুক্ত থাকবে অহংকার ও বড়াই থেকে। অবচেতনভাবেই তার আচার-আচরণ হবে বিনয় ও নম্রতায় পূর্ণ।
- এ বিনয় যার যতটা হাসিল হবে, বান্দা হিসেবে সে ততটাই সফল। আল্লাহ পাকের বিধিবিধানের সামনে সে ততটাই নিজেকে সঁপে দিতে পারবে। শোকর আর কৃতজ্ঞতায় ততটাই আপ্লুত হবে তার হৃদয়-মন। বাহ্যত নিজের শ্রমে-ঘামে কিংবা অর্থ-মেধায় অর্জিত সফলতাকেও যখন সে আল্লাহর দান বলে বিশ্বাস করবে, তার স্তরে উন্নীত নয় এমন কাউকে দেখে তখন তার মনে অহংকারের পরিবর্তে যোগ হবে কৃতজ্ঞতার এক নতুন মাত্রা। পরম বিনয়ে সে মনে মনে বলবে- সকল কৃতজ্ঞতা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই যে নিজেকে এভাবে মিশিয়ে দিতে পারে মাটির সঙ্গে, মাটির পৃথিবীতেই তাকে সম্মানের আসনে বসিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট ঘোষণা-
    - مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِي نَفْسِه صَغِيرٌ، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ.
- আল্লাহর জন্যে যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন; তখন সে নিজের চোখে তুচ্ছ হলেও মানুষের চোখে অনেক বড় বিবেচিত হয়। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৭৭৯০
- এ বিনয় যখন কারও হাসিল হবে তখন এর আলামত প্রকাশ পাবে তার ওঠা-বসায় কথা-বার্তায় এমনকি হাঁটা-চলায়ও। আল্লাহ তাআলার প্রকৃত সেই বান্দাদের বৈশিষ্ট্যাবলি পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে-
    - وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.
- ‘রাহমান’-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে... । -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৩
- আরেক আয়াতে হাঁটাচলায়ও বিনয়-নম্রতার আদেশ করা হয়েছে এভাবে-
    - وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا.

- ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৭
- প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণ ছিল বিনয় ও নম্রতার অনন্য দৃষ্টান্ত। মানুষের সঙ্গে তিনি যেভাবে মিশে যেতেন, তাতে অপরিচিত কেউ দেখলে চিনতেই পারত না-তিনি আল্লাহর রাসূল। সমাজের অসহায় ও নিম্নশ্রেণির লোকদের কাছেও তিনি ছিলেন আপনজনদের চেয়েও বড় আপন। যে কেউ যখন তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারত। হাদীস শরীফে তাঁর এ বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে করেছেন-
- أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ.
- 'তিনি ছিলেন প্রশস্ত হৃদয়-মহানুভব।, সত্যবাদিতায় সর্বাগ্রে, নম্রতা আর কোমলতায় অনন্য, আচার-আচরণে অভিজাত প্রথম যে তাঁকে দেখত ভয় করত, কিন্তু যে-ই তাঁর সঙ্গে মিশতো তাঁকে ভালোবাসত। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬৩৮
- খোদ কুরআনে কারীমেই আলোচিত হয়েছে তাঁর নম্রতা ও বিনয়ের কথা-
- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪.
- আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৫৯
- কী ঘরে কী বাইরে- সর্বত্রই তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিনয়ের ধারক। নিজ হাতে ঘরের কাজকর্ম করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঘরের কাজকর্ম করতেন? তিনি জবাবে বললেন :
- نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِه كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِه.
- হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জুতা সেলাই করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, ঘরের কাজকর্মও করতেন, যেভাবে তোমরা তোমাদের ঘরে কাজ করে থাক। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৫৩৪১
- এক হাদীসে তো ঘরণীদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কেমন ছিল তাও বর্ণিত হয়েছে-
- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي.
- তোমাদের মাঝে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৮৯৫
- অহংকার ছাপিয়ে বিনয় ও নম্রতাকে আপন করে নিতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শোকর ও কৃতজ্ঞতার- এ কথা অনস্বীকার্য। আবার সেই বিনয় যেন শোকরের পথ রুদ্ধ করে না দেয় সেদিকেও সচেতন দৃষ্টি কাম্য। নামায আদায়ের সময় যেমন বিনয়ের সঙ্গে

দাঁড়াতে হবে প্রভুর সামনে, বিনয়ের সঙ্গেই যেমন লুটিয়ে পড়তে হবে সিজদায়, তেমনি এটাও মনে করতে হবে-আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন বলেই নামায পড়তে পেরেছি।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন-
- أَنَا سَيِّدُ ولد آدَمَ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَلاَ فَخْرَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ.
- আমি আদম-সন্তানের সর্দার, তবে এতে বড়াইয়ের কিছু নেই; কেয়ামতের দিন আমার কবরের মাটিই প্রথম সরানো হবে, তবে এটা বড়াইয়ের কোনো বিষয় নয়, আমিই প্রথম সুপারিশ করব, আমার সুপারিশই প্রথম গৃহীত হবে, এতেও অহংকার করার কিছু নেই, কেয়ামতের দিন 'হামদে'র পতাকা আমার হাতে থাকবে, তবে এতেও কোনো বড়াই নেই। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪৩০৮
- একদিকে নিআমতের বর্ণনা, সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ও নম্রতা- এ হাদীস আমাদেরকে এ শিক্ষা-ই দেয়। তাই অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যা আবার শোকর ও কৃতজ্ঞতার পরিপন্থী। নামায আদায়ের পর আল্লাহ তাআলা যে তৌফিক দিলেন সেজন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে যদি কেউ বলে, 'আমার এ নামায দিয়ে কী হবে' কিংবা 'আমাদের নামায তো আসলে কোনো নামাযই নয়'। মনে রাখতে হবে, এ জাতীয় বিনয় আসলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো কাক্সিক্ষত বিষয় নয়।
- দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে চাইলে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন- বিনয়। ইবাদত-বন্দেগি থেকে শুরু করে ঘরে-বাইরে সবার সঙ্গে আচরণে সে বিনয় অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় নিজেকে নীচু করে দেয়ার এ প্রশিক্ষণে যে প্রশিক্ষিত হতে পারবে, অবচেতনভাবেই সম্মান তার কাছে এসে ধরা দেবে; দুনিয়া ও আখেরাতে। দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসায় সে সিক্ত হবে, হাসিল হবে মহান প্রভুর নৈকট্যও।

লজ্জাশীল হওয়া

আরবি 'হায়া' শব্দের বাংলা লজ্জা। লজ্জা এমন এক উৎকৃষ্ট মানবীয় বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে পাপ ও কদর্যতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করে। ভালো ও সৎকাজে উৎসাহিত করে। ইমান ও লজ্জা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপূরক। যার লজ্জা কম তার ইমানও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ লজ্জা ইমানের অঙ্গ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একদা আল্লাহর রাসুল (সা.) এক আনসারির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তার ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের নসিহত করছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ইমানের অঙ্গ।' (সহিহ বুখারি ২৪)

নবীজির লাজুকতা : নবী (সা.) খুব লাজুক ছিলেন। কারণ লজ্জাশীলতা এক উৎকৃষ্ট গুণ। আর যেকোনো উৎকৃষ্ট গুণ নবী (সা.)-এর মধ্যে থাকবে এটাই যৌক্তিক। কেমন লাজুক ছিলেন তা নিম্নোক্ত হাদিস থেকেই অনুমেয়। আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নবী (সা.) অন্দর মহলের পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোনো কিছু অপছন্দ করলে তার চেহারা দর্শনেই আমরা তা বুঝতে পারতাম।' (আদাবুল মুফরাদ ৬০২)

নির্লজ্জ ব্যক্তি যা ইচ্ছা করতে পারে। মানুষ অনেক সময় আল্লাহর ভয়ে নয়তো মানুষের চক্ষুলজ্জায় পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। তার ভেতরে ন্যূনতম লজ্জাশীলতা হয়তো আছে, এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু যে নির্লজ্জ সে এসব কিছুর তোয়াক্কা করে না। তার দৃষ্টিতে সবকাজ ভালো ও বৈধ। কারণ হাদিসে আছে, আবু মাসউদ উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'নবুওয়াতি কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তাতে এটাও আছে, তুমি নির্লজ্জ হতে পারলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।' (আদাবুল মুফরাদ ৬০০)

লজ্জাশীলতা কল্যাণ বয়ে আনে। লাজুকলতা ইমানের বহিঃপ্রকাশ। কোনো মানুষের মধ্যে লজ্জা থাকা মানে সে একজন মুমিন। কারণ ইমান ও লজ্জার সম্পর্ক মাথা ও দেহের মতো। তাই লজ্জাশীল ব্যক্তি কদর্য ও যাবতীয় অনাচার থেকে দূরে থেকে আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার লাভে সক্ষম হয়। যা সবচেয়ে বড় কল্যাণ বা সফলতা। লজ্জাশীল ব্যক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে।' মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সবটুকু মঙ্গল।' কিন্তু গুপ্ত সমস্যায় শরিয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা ঠিক নয়। (যেমন পিরিয়ড, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি) (রিয়াজুস সালেহিন ৬৮৭)

লজ্জা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সুন্দর পোশাকে যেমন দেহের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনই লাজুকলতায় প্রকাশ পায় মুমিনের চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকৃষ্টতা। বিপরীতে লজ্জাহীনতায় বৃদ্ধি পায় খারাবি ও কদর্যতা। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোনো বস্তুর কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোনো জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।' (আদাবুল মুফরাদ ৬০৪)

লজ্জাশীলতা মুমিনের অলংকার। লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ; যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বহুবিদ নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে।লজ্জাশীলতার কারণেই মানুষের মধ্যে স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ ঘটে।জবাবদিহিতার আগ্রহ তৈরি হয়। এমনকি লজ্জা বা সম্ভ্রমের কারণে যাবতীয় জটিলতা, কুটিলতা, পাপ-পংকিলতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।' (বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)লজ্জা যে শুধু মানুষের ঈমানের একটি বিশেষ শাখা তাই নয়, বরং আল্লাহ তাআলা নিজেও এ গুণে গুণান্বিত। হাদিসে এসেছে-'তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে উভয়হাত উঠায়, তখন তিনি বান্দার খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।' (তিরমিজি, আবু দাউদ ও মিশকাত)লজ্জা বা শরম মানুষকে সব অনিষ্ট কাজ থেকে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ সব সময় বিরাহমীহনভাবে মন্দ

কাজ করতে পারে। কোনো কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে ফেরাতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।' (বুখারি ও মিশকাত)রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যা তাঁর হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।হজরত সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব লজ্জাশীল ছিলেন। যে জিনিসিই তাঁর কাছে চাওয়া হতো, তিনি তা দিয়ে দিতেন।হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দা পালনকারী কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন, তখন আমরা তাঁর পবিত্র চেহারা দেখেই বুঝে ফেলতাম।পরিশেষে...লজ্জাশীলতার বিষয়ে বিশ্বনবির ছোট্ট একটি উপদেশ উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য অত্যন্ত জরুরি। আর তা হলো, 'বিশ্বনবি একদিন এক আনসারি সাহাবির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় তার ভাই তাকে বেশি লজ্জাশীল না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। (কারণ জীবিকা অন্বেষণ ও ইলম অর্জনের জন্য ক্ষতিকর) এ কথা শুনে বিশ্বনবি বললেন, 'তাকে এভাবে থাকতে দাও। যেহেতু লজ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি অঙ্গ। (বুখারি ও মিশকাত; হাদিসটি হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন)তবে সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করলে চলবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না।' (সুরা আহযাব : আয়াত ৫৩)সুতরাং সত্য প্রকাশের বিষয় ছাড়া সব কাজেই লজ্জাশীলতা, লজ্জাবোধ মানব জীবনে জাগ্রত থাকা জরুরি। লজ্জা বা সম্ভ্রমই মানুষের জীবনে সুফল বয়ে আনে।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে লজ্জাশীলতার গুণ অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমিন

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা

আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত, যাতে তোমরা (কিয়ামতের দিন) মানুষ সম্পর্কে সাক্ষী হতে পার (বাকারা : ১৪৩)।

সাক্ষীর জন্য মধ্যপন্থী ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য। কেননা তার সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচারক রায় দিয়ে থাকে। সে যদি তার দেখা ঘটনার যথাযথ বিবরণ না দেয়, উভয়পক্ষের মাঝখানে না থেকে কোনও একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সে অনুযায়ী বর্ণনায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় বা দোষ-গুণ বাড়িয়ে-কমিয়ে বলে, তবে ন্যায়বিচার সম্ভব হয় না; বরং নির্দোষ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয় ও দোষী ব্যক্তি খালাস পেয়ে যায় কিংবা লঘু-দোষে গুরুদন্ড বা গুরুদোষে লঘুদন্ড হয়ে যায়। পরিণামে সমাজে জোর-জুলুম ও অন্যায়-অনাচারের পথ খুলে যায়। সুতরাং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়-বিচারের স্বার্থে সাক্ষীর নিরপেক্ষ হওয়া ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য।

এই যে নিরপেক্ষতা, সবকিছুর ঠিক মাঝখানে অবস্থান করা ও বিশেষ কোন দিকে ঝুঁকে না পড়া-একে আয়াতে এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ উম্মত তার সবকিছুতে পরিমিতিবোধের পরিচয় দেবে। কোনও ক্ষেত্রে প্রান্তিকতার পরিচয় দেবে না। বাড়াবাড়ি করবে না ও শৈথিল্যের পরিচয় দেবে না। তা করলে সে নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে। অন্যদের মত প্রান্তিক ও একরোখা সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, যেমন ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়। উম্মত যাতে তার এ বৈশিষ্ট্য না হারায় তাই সকল কাজে তাকে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا

তোমরা আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, বাড়াবাড়ি করো না। সকাল-সন্ধ্যায় (ইবাদতের জন্য) বের হয়ে পড় এবং রাতের কিছু অংশেও। তোমরা অবশ্যই পরিমিতি রক্ষা করো। তাহলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪৬৩)

মানুষের পরম গন্তব্যে পৌঁছার মহাসড়ক হল দীনে ইসলাম। এ দীন আদ্যোপান্ত দুই প্রান্তিকতার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। কোনও জায়গাতেই তা দিকবিশেষে সরে যায়নি। এ ছাড়া যত পথ আছে সবই প্রান্তিকতা দোষে দুষ্ট। তার অনুসরণ মানুষকে একরোখা করে তোলে ও পাপের পথে ধাবিত করে। পরিণামে মানুষ তার পরম গন্তব্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে জীবন হয়ে যায় ব্যর্থ। সে ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে হলে তথা জীবনকে স্বার্থক ও পুণ্যময় করে তুলতে হলে তার একমাত্র উপায় মধ্যপন্থার ধর্ম ইসলামের অনুসরণ।

ইসলামের যথাযথ অনুসরণ সকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করে। কেননা ইসলাম তার শিক্ষার প্রত্যেকটি ধারায় মধ্যাবস্থার প্রতি লক্ষ রেখেছে। 'আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, আয়-ব্যয়, লেনদেন সবকিছুতেই তার এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত অনুসারী তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে হবে মধ্যপন্থারই প্রতিকৃতি। সেজন্য প্রথমেই তাকে ইসলামের প্রতিটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং কোন বিষয়ে ঠিক কী নির্দেশনা ইসলাম দিয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে পথ চলতে হবে। যাতে কোন ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি বা শিথিলতাজনিত প্রান্তিকতা ইসলামী জীবনের এ অনন্য বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করতে না পারে।

'আকীদা-বিশ্বাস : ইসলামে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি 'আকীদা-বিশ্বাসের যতগুলো ধারা আছে তার প্রত্যেকটিতেই মধ্যপন্থার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। সর্বপ্রধান 'আকীদা আল্লাহ তাআলার যাত ও সত্তা সম্পর্কে মানুষের ভেতর নানারকম প্রান্তিকতা বিদ্যমান। কারও বিশ্বাস তিনি এমনভাবেই মানুষের ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-কল্পনা ও বোধ-ভাবনার অতীত যে, সরাসরি তাঁর পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কোনও না কোনও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। সেই মধ্যস্থের মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য পাওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। এর বিপরীতে কারও বিশ্বাস, তিনি এমনই অধিগম্য যাকে বোঝার জন্য এমনকি নবী-রাসূলের শিক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। কেউ তাঁকে সম্পূর্ণ নির্গুণ এক নামসর্বস্ব সত্তা মনে করে,

আবার কারও ধারণা তিনি মানুষেরই মত অংগ-প্রত্যংগধারী। এসবই প্রান্তিক ধারণা। প্রকৃত বিষয় এর মাঝামাঝি। সুতরাং কুরআন মাজীদ যেমন তাঁকে

الكبير المتعال

মহান, সমুচ্চ' বলেছে, তেমনি তিনি বলেন,

فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني

'আমি তো কাছেই, যখন কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই।' অর্থাৎ তিনি মহান ও সমুচ্চ হয়েও বান্দার কাছাকাছি। ফলে তাঁকে ডাকা ও পাওয়ার জন্য কোন মধ্যস্থের দরকার নেই। এমনিভাবে তিনি আদৌ নির্গুণ নন; বরং সমস্ত ভালো গুণের অন্তহীন আধার তিনি। সারা কুরআন জুড়েই রয়েছে তাঁর সে গুণাবলীর বিবরণ। কিন্তু তাই বলে তাঁর সে গুণ মানুষের মত নয় এবং তাঁকে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলী একান্তভাবে তাঁরই শান মোতাবেক-

ليس كمثله شيء

'তাঁর মত নয় কোন কিছু।' অর্থাৎ তিনি যেমন কারও সাথে তুলনীয় নন, তেমনি এমনও নন যে, তাঁর সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা লাভ সম্ভব নয়। তাঁর ইবাদত-আনুগত্যের জন্য যতটুকু জানা দরকার নবী-রাসূলের শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে ততটুকু জানা সম্ভব। এই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ইসলামী 'আকীদার সার-নির্যাস, যা সব রকম প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

নবী-রাসূল সম্পর্কে ইসলামী আকীদা হল- তাঁরা আল্লাহ বা আল্লাহর অবতার নন, নন ফিরিশতাও। তাঁদের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহর গুণে তাঁদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। বরং তাঁরা রক্ত মাংসেরই মানুষ। অন্যসব মানুষের মত প্রাকৃতিক সব বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান তাই বলে তাঁরা সাধারণ মানুষের মত দুর্বলচিত্ত, ইন্দ্রিয়পরবশ ও পাপপ্রবণও নন। তাঁদের প্রতি যেহেতু ওহী নাযিল হয়। তাই তাঁরা ওহী ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন এবং ওহীলব্ধ জ্ঞানের শিক্ষাদাতা হিসেবে এক অপাপবিদ্ধ সত্তা ও সর্বোচ্চ স্তরের আদর্শিক গুণাবলী তাঁরা ধারণ করেন।

সংক্ষেপে এটাই নবী-রাসূল সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে এটা

প্রান্তিকতামুক্ত এক ভারসাম্যমান বিশ্বাস। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিশ্বাসেরই শিক্ষাদান করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ (কাহফ : ১১০)। অর্থাৎ আমি ঈশ্বর নই, ঐশ্বরিক কোন ক্ষমতা আমার নেই। আমি একজন মানুষ, তবে তোমাদের উপর ওহী নাযিল হয় না, আমার প্রতি হয় এবং ওহী সংশ্লিষ্ট বিশেষত্ব আমার আছে বিধায় এক স্বতন্ত্র মর্যাদারও আমি ধারক। এভাবে অতি সংক্ষেপে এ আয়াত নবী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ধারণা আমাদের সরবরাহ করেছে।

এর বিপরীতে নবীগণকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা মনে করা যেমন চরম বাড়াবাড়ি, তেমনি তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের মত দোষগুণসম্পন্ন বলে ধারণা করাটাও তাদের প্রকৃত মর্যাদার পরিপন্থী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে আজ তাঁর উম্মতের মধ্যেই এ উভয়বিধ প্রান্তিকতা লক্ষ করা যায়। এক শ্রেণীর লোক তাঁর নবুওয়াতী এবং তাঁর কথা ও কর্মের প্রামাণিক মর্যাদা স্বীকার করে না। তাদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা একজন বার্তাবাহকের বেশি নয়।

অপর এক দলের বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। তারা তাঁর মর্যাদাদানে চরম বাড়াবাড়ির শিকার। তাদের মতে মাটির মানুষ বলাটা তাঁর পক্ষে অমর্যাদাকর। তাদের মতে তিনি নূরের সৃষ্টি। অনেকে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত নয়; বরং তাদের বিশ্বাস তিনি সর্বজ্ঞানের অধিকারী একজন ঐশ্বরিক এখতিয়ারসম্পন্ন সত্তা। প্রকৃত সত্য এ উভয় ধারণার মাঝখানে। উপরে বর্ণিত আয়াতটি এ উভয় ধারণাই খন্ডন করছে এবং জানাচ্ছে, তাঁকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদার উপরে তুলে খোদা বানিয়ে দিও না এবং নিচে নামিয়ে অমর্যাদাও করো না। নবুওয়াতের যে প্রকৃত অবস্থান সেখানেই তাঁকে থাকতে দাও। তাতেই তাঁর সম্মান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা যেমন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে নিজ মর্যাদা তুলে ধরেছেন, তেমনি সাবধানও করেছেন যাতে মর্যাদাদানের ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করা না হয়। তিনি বলেন,

لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله

‘খৃষ্টান সম্পদ্রায় যেমন মারয়াম-পুত্র (‘ঈসা আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে (এমনকি তারা তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে), তেমনি আমাকে নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো তাঁর বান্দা মাত্র। সুতরাং বলো আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৪৪৫)।

আখিরাত সম্পর্কিত ‘আকীদায়ও গুরুত্বের সাথে এ মাত্রাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আখিরাতের সফলতাই মানব জীবনের পরম লক্ষ এবং সেই লক্ষেই মানুষের যাবতীয় কাজ অনুষ্ঠিত, এতো ঠিক, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সে ইহজগতিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে এবং আখিরাতের সফলতার জন্য দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা জরুরি মনে করবে। এটা বৈরাগ্যবাদ, ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। বরং আখিরাত-বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে মানুষ পার্থিব জীবনের মোহে বুঁদ হবে না, সে পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবে আর তা করবে আখিরাতকে মাথায় রেখে। এভাবে পার্থিব জীবনের স্বচ্ছ-সুষ্ঠু নির্বাহ দ্বারা আখিরাতকে নির্মাণ করবে। আখিরাত যেহেতু অবিনশ্বর আর দুনিয়া নশ্বর, তাই মাত্রাজ্ঞানের দাবি এটাই যে, প্রত্যেকটিকে তার আপন পর্যায়ে রেখে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মপন্থা অবলম্বন করবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে ভালোবাসে সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর যে তার আখিরাতকে ভালোবাসে সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (অর্থাৎ উভয়দিক সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা সম্ভব নয়) সুতরাং তোমরা স্থায়ীকে অস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দাও’(মুসনাদে আহমদ,

হাদীস : ১৯৬৯৭ মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৮৫৩। অর্থাৎ ভালো আখিরাতকেই বাসবে আর ইহজীবনের প্রাসঙ্গিকতা ও আখিরাতের সঞ্চয় হিসেবে দুনিয়ার যা কিছু প্রয়োজন মোহমুক্ত হয়ে তাও আনজাম দিয়ে যাবে। এই মাত্রাজ্ঞানের অনুসরণেই উভয় জাহানের কল্যাণ। সে কল্যাণ অর্জনের জন্যই দুআ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দাও দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ আর আমাদেরকে রক্ষা কর জাহান্নামের আযাব থেকে' (বাকারা : ২০১)।

যেকোন 'আকীদায় মধ্যপন্থা ত্যাগ করলে পথভ্রষ্টতা হয় তার অনিবার্য পরিণতি। ইতিহাসে এ পর্যন্ত বহুলোক এভাবেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি এ কারণে বহু দল-উপদলও সৃষ্টি হয়েছে। বরং সত্যকথা হচ্ছে মুসলিম জাতিসত্তার ভাঙন সৃষ্টি ও ইসলামের ভেতর নানা-ফির্কার উৎপত্তি প্রধানত আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা পরিত্যাগেরই কুফল। মু'তাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, কাদরিয়া, খারিজী, রাফিজী, বাতেনী, কারামাতী প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহ এভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। কোন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে বিশেষ কোন আকীদায় শিথিলতাকে কেন্দ্র করে এবং কোনওটির মূলে রয়েছে সেই 'আকীদা বা অন্য কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়িজনিত প্রান্তিকতা। উল্লেখ্য, কোন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির শিথিলতাহেতু যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় অন্যের প্রতি আচরণে তারাও কিন্তু বাড়াবাড়ির পরিচয় দেয় ও চরমপন্থা অবলম্বন করে। তাছাড়া এমনিতেও সেই শিথিল দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরই একরকম বাড়াবাড়ি ও হঠকারিতা নিহিত থাকে এবং থাকে নিজ মত ও চিন্তাভাবনার উপর সীমাতিরিক্ত আস্থা ও অহমবোধ। তাই দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তারা ভিন্নমতকে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং এ হিসেবে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি মূলত একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কিংবা বলা যায় সীমালঙ্ঘন ও অহমবোধই আসল রোগ। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে বাড়াবাড়ির প্রতি অংগুলিনির্দেশ করে তার অনিষ্টতা সম্পর্কে উম্মতকে সাবধান করেছেন ও তা পরিহার করে মধ্যপন্থা আকড়ে ধরার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, (অর্থ) কথা ও কাজে সীমালঙ্ঘনকারীগণ ধ্বংস হোক' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭০)। আরও ইরশাদ করেন, (অর্থ) সাবধান তোমরা দীনের ভেতর বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা দীনের ভেতর বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৩০৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩০২৯; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৮৭১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৮৬৭)

ইবাদত-বন্দেগী : মানব জীবনে ইবাদত-বন্দেগী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরই জন্য মানুষের সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, (তরজমা) আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে (যারিয়াত : ৫৬)। নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ এ চারটিই প্রধান ইবাদত। এগুলো ইসলামের রুক্ন বা স্তম্ভ। এছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ গুরুত্বের কারণেই কুরআন-হাদীসে এসব বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষাদান

করা হয়েছে এবং এর গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি সুস্পষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও কুরআন-হাদীসে মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাবধান করা হয়েছে যাতে কেউ এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা- এ দুই প্রান্তিকতার কোনওটারই শিকার না হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) তুমি নিজের নামায বেশি উঁচু স্বরে পড়বে না এবং অতি নিচু স্বরেও না। বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে (বনী ইসরাঈল : ১১০)। ইবাদতের জন্যই যেহেতু মানুষের সৃষ্টি তাই এ ব্যাপারে শিথিলতার অবকাশ না থাকাটা তো স্পষ্ট, যা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। তা সত্ত্বেও কুরআন-হাদীসে বারবার সাবধান করা হয়েছে, যাতে চিন্তা-চেতনা ও ব্যবহারিকভাবে এ ব্যাপারে কেউ শিথিলতা প্রদর্শন না করে। বিশ্বাস ও চিন্তাগত শিথিলতা মানুষকে গোমরাহ বানিয়ে দেয়, এমনকি ইসলাম থেকে খারিজও করে দেয়। কেউ যদি এ চার মৌলিক ইবাদতের গুরুত্বকে খাটো করে দেখে এবং এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, তবে সে ঈমানহারা হয়ে যায়। আর তা স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তবে পালন না করলে ফাসেক ও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়। উভয়ের জন্যই রয়েছে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি। অস্বীকারকারীর জন্য স্থায়ী শাস্তি, আর আমলে অবহেলাকারীর জন্য অস্থায়ী শাস্তি। সে শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ইবাদতে শিথিলতা অবশ্য পরিত্যাজ্য। মানুষ যাতে সর্ববিধ শিথিলতা ত্যাগ করে ইবাদতকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় ও নিষ্ঠার সাথে তা পালনে রত হয়, সে জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহদান উভয় পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) যারা অহংকারে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয়, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, লাঞ্ছিত হয়ে (মুমিন : ৬০)। এবং ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার (হজ্জ : ৭৭)। তাছাড়া আলাদাভাবে প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পর্কেও বহু আয়াত ও হাদীস আছে, যা সবরকম শিথিলতা ত্যাগ করে আমলে যত্নবান হওয়ার তাগিদ ও উৎসাহ যোগায়।

ইবাদত-বন্দেগীতে শৈথিল্যেরর মত বাড়াবাড়িও নিন্দনীয়। এটাও বহুবিধ অনর্থের কারণ। বিশ্বাস ও চিন্তাগত বাড়াবাড়ি তো গোমরাহীর কারণ হয়ে যায় এবং অনেক সময় তা মানুষকে ইবাদতের প্রতি নিরুৎসাহীও করে তোলে। আর কর্মগত বাড়াবাড়ির সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হল ইবাদতের স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা নষ্ট হওয়া। কেননা ইবাদতে মাত্রাজ্ঞান হারালে ক্লান্তি ও অবসাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যার পরিণাম ইবাদতকে বিদায় জানানো। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, (অর্থ) যে কেউ (সাধ্যাতীত আমলে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে) দীনকে কঠিন করে তোলে, দীন তাকে কাবূ করে ফেলে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৯

পক্ষান্তরে পরিমিতি রক্ষা করলে অবসাদ দেখা দেয় না, স্ফূর্তি বজায় থাকে। ফলে ইবাদত স্থায়ী হয়। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমলের এ পরিমাণই বহন কর যার ক্ষমতা তোমাদের আছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪৬৫)। অর্থাৎ যা করতে সক্ষম তাই কর। সাধ্যের অতীতে লিপ্ত হতে যেও না। কেননা তা ধরে রাখতে

পারবে না। পরিমিত পরিমাণ করলে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যেতে পারবে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সেই আমলই বেশি প্রিয় যা অল্প হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪৬৫)।

একবার তিনজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাদেরকে যখন তা জানানো হল তারা অবাক হলেন। কারণ তার পরিমাণ তাদের ধারণা অপেক্ষা ঢের কম ছিল। তাদের ধারণা ছিল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবারাত্র নামায-রোযাতেই কাটান। কখনও রাতে ঘুমান না এবং কোনও দিন বিনা রোযায় কাটান না। পরক্ষণে তারা ভাবলেন, তাঁর তো এত বেশি ইবাদতের দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা তাকে নিষ্পাপ রেখেছেন-তাঁর কোনো গুনাহ নেই। তাই খুব বেশি ইবাদত করার তাঁর দরকার নেই। অন্যরা তো তাঁর মত নয়। তাদের অনেক গুনাহ হয়ে যায়। তাই তাদেরই বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে। সেমতে একজন বললেন, আমি রাতভর নামায পড়ব। কখনও ঘুমাব না। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি জীবনভর প্রত্যেকদিন রোযা রাখব। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারীসংগ পরিহার করে চলব। কখনো বিবাহ করব না। তাদের একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এই-এই কথা বলেছ? শোন, আমি কিন্তু আল্লাহকে তোমাদের অপেক্ষা বেশি জানি। তাই তোমাদের অপেক্ষা তাকে ভয়ও বেশি করি, অথচ আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোনও দিন রাখি না। আমি নামাযও পড়ি এবং ঘুমাইও আর আমি বিবাহও করেছি। (এটাই আমার সুন্নত ও নিয়ম)। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত উপেক্ষা করে সে আমার দলের নয় (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪০১; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৩২১৯)। মধ্যপন্থা ও পরিমিতি রক্ষা সম্পর্কে এ হাদীস এক সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সীমালংঘন সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী। ইবাদতে পরিমিতি সম্পর্কে এরকম আরও বহু হাদীস আছে। সবগুলোর একত্রীকরণ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কেবল ইবাদত-বন্দেগীতে শরীয়তের বিশেষ মেযাজ। তথা মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা। সে জন্য দু' একটি হাদীসের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

প্রকাশ থাকে যে, এই পরিমিতি রক্ষার জন্য কোন্ ইবাদত কোন্ পর্যায়ের সে সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। যাতে অজ্ঞতাজনিত কারণে কোন ইবাদতকে তার আপন অবস্থান থেকে উপরে উঠানো বা নিচে নামানোর প্রান্তিকতা দেখা না দেয়।ফরয-ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব-সাধারণভাবে ইবাদত এই চার স্তরের। এর প্রত্যেকটিকে আপন আপন স্থানে রাখাই পরিমিতিবোধের দাবি এবং সেটাই শরীয়তের যথার্থ অনুসরণ। ফরয-ওয়াজিবকে যেমন সুন্নত-মুস্তাহাবের স্তরে নামানো ঠিক নয়, তেমনি সুন্নত-মুস্তাহাবকেও ফরয-ওয়াজিবের মর্যাদা দেওয়া সংগত নয়। এতে দীনের প্রকৃত কাঠামো যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি উম্মতের সম্প্রীতি নষ্টেরও পথ তৈরি হয়। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা হয়, রমযানের রোযা, মালের যাকাত ও বায়তুল্লাহর হজ্জকে ঐচ্ছিক সাব্যস্ত করা হয় তবে তাতে দীনে ইসলামের

অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কেউ তা করলে তার নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়ার সুযোগ থাকে না। বেশ আগে থেকেই এক শ্রেণীর লোক এজাতীয় চিন্তা পোষণের মাধ্যমে দীনের অবকাঠামোয় ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাতে শাশ্বত ও সুরক্ষিত দীন ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও তাদের নিজেদের ধার্মিকতা যে বিধ্বস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সংগে বৃহত্তর মুসলিম জাতিসত্তার এই ক্ষতি হয়েছে যে, এর ফলে বিভক্তিতে মাত্রাযোগ হয়েছে, নতুন ফেরকার গোড়াপত্তন হয়েছে।

একই রকমের কুফল রয়েছে এর বিপরীত প্রান্তিকতার ভেতর। অর্থাৎ সুন্নত-মুস্তাহাবকে ফরযের মর্যাদা দিলে তাতেও দীনের অবকাঠামো বদলে যায়। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. দীনের ভেতর রদবদল ঘটার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, 'আরেকটি কারণ হচ্ছে বাড়াবাড়ি। অর্থাৎ এমন কঠিন কঠিন ইবাদত অবলম্বন করা, শরীয়ত যার আদেশ করেনি, যেমন সারা বছর রোযা রাখা, রাতভর ইবাদত করা, সংসার জীবন পরিহার করা, বিবাহ না করা এবং সুন্নত-মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের মত গুরুত্ব দেওয়া। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/১২০)

এ জাতীয় বাড়াবাড়ির ফলে বিভক্তিপ্রবণতাও উসকানি পায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যেসব আত্মকলহের ঘটনা ঘটেছে তার পেছনে এরকম বাড়াবাড়ির ভূমিকা নেহাত কম নয়। সন্দেহ নেই সুন্নত-মুস্তাহাবও দীনের একটা অংশ এবং ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেই প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকবে তখনই যখন তাকে তার আপন অবস্থানে থাকতে দেওয়া হবে। বাইরের আলো বাতাস দ্বারা গৃহাভ্যন্তরকে স্বচ্ছন্দ ও স্নিগ্ধময় করে রাখার পক্ষে জানালা ও গবাক্ষের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে ভূমিকার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে জানালা ও গবাক্ষকে যথাস্থানে যথারূপে রাখাই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ তাকে যদি গৃহস্থদের চলাচল পথ তথা দরজার আকার-প্রকারে নিয়ে আসা হয়, তাতে দুয়েরই মহিমা ক্ষুণ্ন হয়। উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও বিষয়টা

সে রকমই। সুন্নত-মুস্তাহাবকে ফরয-ওয়াজিবের মর্যাদা দিলে এভাবেই উভয়ের মহিমা ক্ষুণ্ন হয় এবং কার্যত উভয়টাই অস্তিত্ব-সংকটের শিকার হয়।

সুন্নত-মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আরও একটা বিষয় জানা দরকার। তা হচ্ছে এর পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য। শরীয়াতে এমন বহু কাজ আছে যা করার সুন্নতসম্মত পন্থা একাধিক- প্রতিটি পন্থা হাদীস দ্বারা প্রমানিত। তবে হাদীসের শাস্ত্রীয় নীতিমালার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে কোন্ পন্থা অপেক্ষা কোন্ পন্থা প্রাধান্য পায় তা নিয়ে মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, এক মুজতাহিদের কাছে এক পন্থা অগ্রগণ্য মনে হয়েছে তো অন্য মুজতাহিদের কাছে অন্য পন্থা। এ হিসেবে একজনের কাছে এক পন্থা আফযল (উত্তম), তো অন্যজনের কাছে অন্য পন্থা। পন্থা যে উভয়টিই জায়েয ও অনুসরণযোগ্য তা নিয়ে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ কেবল অগ্রগণ্যতা নিয়ে। রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে মাথা তুলে হাত তোলা হবে কি হবে না, দোয়া কুনূত রুকূর আগে পড়া হবে, না পরে, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে, না নিচুস্বরে, ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা হবে, না বার তাকবীর ইত্যাদি বিষয়গুলো এ রকমই।

সুতরাং এজাতীয় মাসাইলে পরিমিতিবোধের পরিচয় দেওয়া খুবই জরুরি। অর্থাৎ আমি যে পন্থাই অনুসরণ করি না কেন, তাকে আফযলের বেশি কিছু ভাবব না এবং বিপরীত পন্থাকে অবৈধ ঠাওরাব না। আমার কাছে আমার অনুসৃত পন্থা যেমন উত্তম অন্যের কাছে দ্বিতীয় পন্থাও তেমনি উত্তম। কার্যত আমরা উভয়ই উত্তম পন্থার অনুসারী। সুতরাং কারও বিরুদ্ধে কারও আপত্তি তোলার সুযোগ নেই; বরং উভয়েই সুন্নত ও উত্তম পন্থার অনুসারী হিসেবে মহববত ও সম্প্রীতির সাথে সহাবস্থান করব। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এসব মাসাইলে পরিমিতিবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মহল বিশেষকে দেখা যাচ্ছে একটি পন্থাকে সুন্নত ও দ্বিতীয় পন্থাকে সুন্নতবিরোধী সাব্যস্ত করত জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। যেখানে উচিত ছিল এজাতীয় দ্বান্দ্বিক ও উসকানিমূলক তৎপরতা পরিহার করে উম্মতের মধ্যে তাওহীদী চেতনার বিস্তার, শিরকের মূলোৎপাটন, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা প্রচার, ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী প্রচারণার উপযুক্ত জবাবদান, নাস্তিক্যবাদের মুকাবিলা ও ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। সেখানে তারা বিভক্তি-বিভাজনের ইস্যু তৈরির তৎপরতায় নিজেদের মূল্যবান সময় ও সম্পদ নষ্ট করছে।

আজ উম্মত কি কেবল ভূমি আগ্রাসনেরই শিকার? তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি শত্রুকবলিত, শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শচ্যুত, চিন্তা-চেতনা কুফরাচ্ছন্ন, অর্থ-সম্পদ শত্রুনিয়ন্ত্রিত, সমরশক্তি রুগ্ন ও ন্যুব্জ, আখলাক-চরিত্র বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত, তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পরনির্ভর, তাদের শিল্প-সাহিত্য অপসংস্কৃতি-জর্জর, রাজনীতি লক্ষভ্রষ্ট, রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা শক্তি মদমত্তদের ভূ-রাজনৈতিক চালিয়াতির শিকার, বহুজাতিক কর্পোরেট বাণিজ্যের শোষণে নির্জীব নিরক্ত, নানামুখী অপপ্রচার ও তথ্যসন্ত্রাসে দিশেহারা, স্যাটেলাইট সংস্কৃতির থাবায় বিসন্ত্র, তারা বহিঃশত্রুর অবিরাম হামলা ও গৃহশত্রুর নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, বহুজাতিক আত্মকলহ ও বিরোধ-বিসংবাদে নাকাল-নাজেহাল। এহেন পরিস্থিতিতে উসকানিমূলক তৎপরতার মাধ্যমে শত্রুর এজেন্ডা বাস্তবায়নে ভূমিকা না রেখে দরকার উম্মতের অস্তিত্ব রক্ষা ও নবচেতনায় ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে

সুচিন্তিত পরিকল্পনার আওতায় গঠনমূলক ও কল্যাণমুখী কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কীভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মুকাবিলা করা যায়, কীভাবে বিক্ষিপ্ত-বিভক্ত উম্মতকে একাট্টা করা যায়। কোন্ পন্থায় তাদের বহুরৈখিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এবং তাদের সকল শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিনাশক ভূমিকা থেকে উদ্ধার করে নির্মাণমুখী করার উপায় কী এসবই এখন মুখ্য ভাবনার বিষয়। এ ভাবনার জন্য মানসিক ইতিবাচকতা ও দৃষ্টির প্রসারতা দরকার। দরকার একদেশোদর্শী মনোভাব পরিবর্তন করে উদার ও ভারসাম্যবান দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা।

পূর্ণ ঈমানি জীবন গঠন

পূর্ণ ঈমানি জীবন গড়তে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গভীর করা, তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা এবং সর্বোত্তম চরিত্র গঠন করা জরুরি

।এটি অর্জনের জন্য কোরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন, আল্লাহর জিকির, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা, সাহাবিদের জীবনী চর্চা করা এবং নম্রতা ও লজ্জাশীলতা ধারণ করার মতো আমলগুলো নিয়মিত করা উচিত।

পূর্ণ ঈমানি জীবন গড়ার উপায়

- ঈমানের স্তম্ভগুলোর ওপর বিশ্বাস: আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর নাজিল করা কিতাবসমূহের (কুরআনসহ), তাঁর রাসুলগণের এবং পরকাল ও তাকদীরের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করুন।
- কুরআন ও জিকির: নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করুন এবং আল্লাহর জিকির বা স্মরণ করুন, কারণ এগুলো ঈমানকে শক্তিশালী করে।
- সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা: মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন, যা তাঁর মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে।
- সর্বোত্তম চরিত্র: নিজের চরিত্রকে সর্বোত্তম করার চেষ্টা করুন। আপনার আচরণ, বিশেষ করে স্ত্রীর সাথে আচরণ, আপনার ঈমানের পরিপূর্ণতার প্রমাণ দেয়।
- সাহাবিদের জীবনী চর্চা: সাহাবিদের জীবন ও ঈমান থেকে শিক্ষা নিন, কারণ তাঁদের ঈমানকে অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা তৈরি করুন।
- নম্রতা ও লজ্জাশীলতা: নিজের মধ্যে নম্রতা ও লজ্জাশীলতা ধারণ করুন, যা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- প্রবৃত্তিকে অনুসরণ না করা: নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আদেশের অনুগত করুন। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করার শক্তি পাওয়া যায়।
- প্রতিদিনকে নতুন করে শুরু করা: প্রতি সকালে একটি নতুন দিনকে নতুনভাবে শুরু করার প্রেরণা হিসেবে দেখুন এবং অলসতা ত্যাগ করে কর্মঠ হন।
-

প্রতিটি সূর্যাস্ত যেমন আমাদের চিরবিদায়ের বার্তা দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্রতিটি সূর্যোদয় আমাদের জীবনকে নতুন করে শুরু করার আহ্বান জানায়। অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলে নব উদ্যমে জীবনকে সাজানোর প্রেরণা জোগায়। জীবনকে আরো উন্নত, আরো কর্মময়, আরো গতিশীল করার বার্তা দিয়ে যায় প্রতি দিনের সূর্যোদয়।

আজ আমরা কোরআনুল কারিমের আলোকোজ্জ্বল চিরশাশ্বত তিনটি নির্দেশনা নিয়ে কথা বলব, যেগুলো আমাদের এলোমেলো অগোছালো জীবনকে সাজিয়ে তুলবে।

জীবনকে করে তুলবে আরো কর্মময়, আরো গতিশীল।

১. ইসতেগফার

ইসতেগফার মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। মহান রবের কাছে নিজের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলা। নিজের ক্ষুদ্রতা-হীনতা স্বীকার করে মহামহিম আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া।এই ইসতেগফার সুখময় উন্নত জীবন লাভের অনন্য উপায়। ইসতেগফার জীবনকে সাজিয়ে তোলে। পাপের পংকিলতা থেকে উঠিয়ে নেকির পবিত্র আবেশে মন মানসকে স্নিগ্ধ করে তোলে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে

মুমিনের দল, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তার দিকে ফিরে যাও। এতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পাররে।' (সুরা নুর, আয়াত : ৩১)

২. তাকওয়া

তাকওয়া মানে কী? তাকওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ বেঁচে থাকা। হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.) তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহর ভয়ে শিরক থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা।' (তাফসিরুল কোরআনিল আজিম : ১/৫৪)

ইমাম কুরতুবি (রহ.) তাঁর তাফসিরে তাকওয়ার ব্যাখ্যায় বলেন, একবার আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) উবাই ইবনে কাব (রা.)-কে তাকওয়ার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা.) তখন পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় দিয়ে পথ চলেছেন? উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ। উবাই (রা.) বলেন, তখন কিভাবে পথ চলেছেন? কাপড় টেনে খুব সতর্কতার সঙ্গে চলেছি, যেন গায়ে কাঁটা না লাগে—উমর (রা.)-এর জবাব।

উবাই (রা.) বলেন, এটাই তাকওয়া। অর্থাৎ খুব সতর্কতার সঙ্গে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করা, যাতে কখনো আল্লাহর নাফরমানি না হয়ে যায়। আমার স্রষ্টা যেন সব সময় আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।' (আল জামে লি আহকামিল কোরআন : ১/১৪৭)

মুমিনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই তাকওয়া। ঈমানদার যথার্থভাবে আল্লাহভীতিকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দেবে—একজন মুমিনের কাছে এটা কোরআন ও ঈমানের দাবি। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা, অন্তরে আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান, অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে তোমরা মুসলিম।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

৩. যিকরুল্লাহ

যিকরুল্লাহ মানে আল্লাহর স্মরণ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করা। হৃদয়ে মননের গভীরে আল্লাহর নাম বদ্ধমূল করে নেওয়া। জীবনজুড়ে আল্লাহর বড়ত্বের জয়গান গাওয়া। প্রতিটি নিঃশ্বাসে আল্লাহর পবিত্র নাম উচ্চারণ করা।

আপনার হৃদয়ে অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কোথাও প্রশান্তির দেখা পাচ্ছেন না, ডিপ্রেশনের অতলে হারিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আপনি অজু করে পাক পবিত্র হোন। এরপর আল্লাহর জিকির করুন। কোরআন তিলাওয়াত করুন। কোরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর জিকিরে মনোনিবেশ করুন। দেখুন, আপনার হৃদয়রাজ্যে কী অনাবিল প্রশান্তির সুবাতাস বয়ে যাচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে, মনে রেখো! জিকিরের মাধ্যমেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সুরা রাদ, আয়াত : ২৮)

তাই আসুন, প্রতিটি সূর্যোদয়ের বার্তা গ্রহণ করে জীবনকে সাজিয়ে তুলি। ইসতেগফার, তাকওয়া ও জিকরুল্লাহর আলোয় নিজেদের উদ্ভাসিত করি।

পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কী? সবচেয়ে দামী জিনিষ কী? অন্তরে শীতলতা আনয়নকারী সবচেয়ে মধুরতম স্পর্শ কিসে পাওয়া যায়? জ্বি, তা পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহর যিকিরে। আল কুরআনে 'আল্লাহর স্মরণ'কে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। আর অন্তরের প্রশান্তির মাধ্যমও যে এই যিকির তাও স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে এটাই স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তাআলা যেমন সর্বোচ্চ এবং সুমহান, তাঁর নামের স্মরণও তেমনিভাবে সবকিছুর উপরে মর্যাদাবান এবং সুউচ্চ। তাই আমরা প্রকৃতপক্ষেই যদি শান্তি-প্রশান্তি খুঁজতে চাই আমাদের ফিরে আসতে হবে আসল মালিকের কাছে। সত্যিকারের সুখ একমাত্র তাঁর স্মরণেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার পবিত্র নামের বরকত ও লযযত এবং স্বাদ ও আনন্দ তুলনাবিহীন। অন্য কোনো কিছুতে তা নেই। যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর যিকির দ্বারা বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়। আল্লাহর যিকির এমন এক শক্তি, যা দুর্বলকে সবল করে এবং সকল বিপদে দৃঢ়পদ রাখে। কারণ, আল্লাহর যিকির যিনি করেন তার বিশ্বাস এই যে, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং আল্লাহর কোনো ফয়সালা বান্দার জন্য অকল্যানকর নয়। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেয়ার মাঝেই বান্দার কামিয়াবি ও কল্যাণ। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। অন্য কোনো ইবাদত সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়নি। কারণ, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ এমন এক বিষয়, যা মানুষকে সব ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চলতে সাহায্য করে। উপরন্তু তা এত সহজ যে, এর জন্য আলাদা করে বেশি সময় ব্যয় করার কিংবা অন্যান্য কাজ স্থগিত রাখারও প্রয়োজন হয় না। সকল কাজের মাঝেই যিকির রয়েছে। সুন্নত অনুযায়ী প্রতিটি আমল মাসনূন দুআসহ করলে তাতে যিকিরের সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। একইসাথে কাজে মগ্ন থেকেও সাধ্যানুসারে যিকির চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বস্তুতঃ আল্লাহর যিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রূহ। আবু ওসমান নাহদী রাহ. বলেন, কুরআন মজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।

তওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে সুখ অর্জন

তওবা অর্থ ফিরে আসা; ইস্তিগফার মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা। 'নাস' (মানব) মানেই ভুল, 'ইনসান' (মানুষ) মানে যে ভুলে যায়। প্রথম মানুষই প্রথম ভুল করেছিলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরম ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়। তিনি বান্দার ভুলত্রুটি, পাপতাপ, যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা ও মার্জনা করেন এবং দয়া বর্ষণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদহানি, প্রাণহানি ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে; তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা তাদের প্রতি মুসিবত আপতিত হলে বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।" তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭)

বান্দা ইস্তিগফার করলে আল্লাহ আজাব দূর করে দেন। কোরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে, 'আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তখনো আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।' (সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৩)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾]البقرة :١٥٢[﴿

তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। -সূরা আল বাক্কারা, আয়াত-১৫২

সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হই তখন একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে স্মরণ করছেন। এতে যিকিরের স্বাদ ও লযযত বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'সব মানুষই অপরাধী, তাদের মধ্যে উত্তম হলো তওবাকারী।' (তিরমিজি: ২৪৯৯; মুসনাদে আহমাদ: ১৩০৪৯; ইবনে মাজাহ: ৪২৫১) 'যদি কেউ গুনাহ মাফের উদ্দেশ্যে ইস্তিগফার করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তিনটি পুরস্কার দেবেন—তার জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করবেন, তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন, তাকে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয় স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।' (মুসলিম ও তিরমিজি)

দোষে-গুণে মানুষ। মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্য বিদ্যমান। কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর আল্লাহ তাকে (মানবসত্তায়) অপরাধপ্রবণতা ও তাকওয়া বা সতর্কতার জ্ঞান দান করলেন।' (সুরা আশ-শামস, আয়াত: ৮) 'আর আমি তাকে (ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-

অন্যায়) দুটি পথ দেখিয়ে দিয়েছি (যাতে সে সঠিক পথে চলতে পারে)।' (সুরা আল-বালাদ, আয়াত: ১০)

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, 'বান্দা যদি দৈনিক ৭০ বার অপরাধ করে এবং ৭০ বার ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।'

রাসুলুল্লাহ (সা.) দৈনিক ৭০ বারের অধিক বা ১০০ বার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। অথচ তিনিসহ সব নবী-রাসুল (আ.) ছিলেন মাসুম বা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। কারণ, তওবা ও ইস্তিগফার স্বতন্ত্র ইবাদত। এতে আল্লাহ বেশি খুশি হন।

তওবা ও ইস্তিগফারের জন্য কোরআন মাজিদে ও হাদিস শরিফে বহু দোয়া রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোয়াটিকে বলা হয় 'সাইয়িদুল ইস্তিগফার' বা ক্ষমার শ্রেষ্ঠ আবেদন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যদি কেউ সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বাসের সঙ্গে "সাইয়িদুল ইস্তিগফার" পাঠ করে, সে যদি ওই দিন রাত্রে বা দিবসে ইন্তেকাল করে, তাহলে সে জান্নাতি হবে।'

সুখী থাকতে চাইলে হিংসা ও অহংকার পরিত্যাগ

হিংসা ও অহংকার পরিত্যাগ করতে হলে নিজের মধ্যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও ঈর্ষা দূর করতে হবে, অন্যের যোগ্যতা ও ভালো কাজের প্রশংসা করতে হবে এবং বিনয়ী হতে হবে।এই দুটি গুণ বর্জন করা জরুরি কারণ এগুলো মানব জীবনের শান্তি নষ্ট করে এবং নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অহংকার ও হিংসা পরিহার করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় নিচে দেওয়া হলো:

হিংসা ও অহংকার পরিত্যাগ করার উপায়

- **নিজের মধ্যে ক্ষমা ও উদারতা তৈরি করুন:** অন্যের ভালো কিছু দেখলে হিংসা না করে তাকে অভিনন্দন জানান।
- **অন্যকে সম্মান করুন:** অন্যকে হেয় করে নিজে বড় হওয়ার চেষ্টা না করে, সবাইকে সমান সম্মান ও মর্যাদা দিন।
- **আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন:** মনে রাখবেন যে, কোনো কিছুই নিজের ইচ্ছায় হয় না। আল্লাহ যা দেন, তাই নিয়তি। এর উপর বিশ্বাস রেখে অন্যের প্রতি হিংসা করা থেকে বিরত থাকুন।
- **অহংকারের কুফল সম্পর্কে জানুন:** অহংকার মানুষকে অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শেখায়, যা তাকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তার জ্ঞানকে হ্রাস করে।
- **অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হন:** অন্যের দুঃখে সমব্যথী হলে এবং তাদের প্রয়োজনে পাশে থাকলে হিংসা ও অহংকার কমে যায়।

- **ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করুন:** নিজের জীবনে যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন এবং অন্যের ভালো দিকগুলো নিয়ে ইতিবাচক চিন্তা করুন।
- **অন্যের ভালো কাজের প্রশংসা করুন:** অন্যের ছোট ছোট ভালো কাজের প্রশংসা করলে তাদের প্রতি আপনার মন নরম হবে এবং হিংসা থেকে দূরে থাকা যাবে।
- **নিজেকে যোগ্য ভাবা থেকে বিরত থাকুন:** নিজের যোগ্যতা নিয়ে কখনো অহংকার করবেন না, বরং বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখুন।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

মুসলিম ব্যক্তি তার উপর পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, আরও বিশ্বাস করে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার আবশ্যকতার প্রশ্নে; এটা শুধু এ জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্ব ও জন্মের উপলক্ষ, অথবা তাঁরা তার জন্য এমন সুন্দর সুন্দর ও ভালো ভালো অবদান রেখেছেন, যা তাকে প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের সাথে সেরূপ উত্তম আচরণ করতে বাধ্য করে, বরং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আবশ্যকতার অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন এবং সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টিকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি বান্দা কর্তৃক একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আবশ্যকীয় অধিকারের সাথে এ বিষয়টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন; আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[1] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ ﴾ [لقمان: ١٤]

"আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।"

আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে না। বান্দার হকের মধ্যে পিতা–মাতার হক সর্বাগ্রে। সন্তানের প্রতি পিতা–মাতার হক বা অধিকার হলো সন্তান পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কষ্ট দেবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক করো না এবং পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ৩৬)। 'আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা–মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।' (সুরা-৪৬ আহকাফ, আয়াত: ১৫)। 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যে তুমি আমার এবং তোমার পিতা–মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।' (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত: ১৪)।

একজন সাহাবি নবীজি (সা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি আবারও জানতে চাইলেন, নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মায়ের। এরপর সাহাবি জানতে চাইলে নবীজি (সা.) বললেন, তোমার বাবার। (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পিতা–মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ)। পিতা–মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিসম্পাত, তেমনি তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।' (বায়হাকি)।

এক সাহাবি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)–কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমার পিতা–মাতা ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে?' তখন নবী করিম (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। তা হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা–ইস্তিগফার করা, তঁাদের শরিয়তসম্মত অসিয়তগুলো আদায় করা, তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো পিতা–মাতার মৃত্যুর পরও তঁাদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল।' (আবু দাউদ)। অন্য হাদিসে আছে, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিজি)। পিতা–মাতার জন্য দোয়া করতে কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তঁাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' (সুরা-১৭ বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৪)।

পিতা মাতার হক ১৪ টি

সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয় কর্তব্য হলো

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে সুখে থাকার মূলমন্ত্র হল তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সেবা প্রদর্শন করা।এটি কেবল একটি নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ও বটে, যা জীবনের সুখ ও শান্তি নিয়ে আসে।

মূল দিকগুলো হলো:

- **শ্রদ্ধা ও বিনয়:** তাদের প্রতি সবসময় সম্মানজনক এবং বিনয়ী আচরণ করতে হবে। তাদের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলা এবং তাদের সম্মান করা উচিত।
- **সেবা ও যত্ন:** তাদের শারীরিক ও মানসিক সেবা করতে হবে। নিজেরা কষ্ট করে হলেও তাদের আরাম ও সুখ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত।
- **ভালোবাসা ও সমর্থন:** তাদের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং মানসিক সমর্থন থাকা জরুরি। তাদের প্রয়োজনে সবসময় পাশে থাকতে হবে।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাই তাদের খুশি রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **সঠিক আচরণ:** তাদের নির্দেশ মেনে চলা, বিশেষ করে যদি তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশের পরিপন্থী না হয়।
- **কৃতজ্ঞতা:** তারা শৈশবে যেমন আমাদের সেবা করেছেন, তেমনভাবে তাদের খেদমত করা উচিত।

- এই মূলনীতিগুলো অনুসরণ করলে জীবনে মানসিক শান্তি ও সুখ লাভ করা সম্ভব।

কৃপণতা সুখে থাকার প্রতিবন্ধকতা

কৃপণতা হলো অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক একটি স্বভাব
, যা কখনও কখনও মৌলিক প্রয়োজন মেটানো থেকেও বিরত রাখে। এই স্বভাবের কারণে মানুষ সম্পদ জমা করতে থাকে এবং অন্যদের সাথে তা ভাগ করে নিতে চায় না। ইসলামে কৃপণতাকে একটি নিন্দনীয় স্বভাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে প্রদত্ত সম্পদ গোপন করতে নিষেধ করেছেন।

কৃপণতার বৈশিষ্ট্য

- **অনিচ্ছাকৃত ব্যয়:** কৃপণ ব্যক্তিরা টাকা খরচ করতে দ্বিধা বোধ করে, এমনকি যদি তা তাদের নিজেদের বা অন্যের প্রয়োজনেও হয়।
- **সম্পদ সঞ্চয়:** তারা সম্পদ জমা করতে চায় এবং সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে তোলে, যা প্রায়শই কোনো ভালো কাজে আসে না।
- **অপ্রয়োজনীয় ত্যাগ:** কৃপণতা মানুষকে এতটাই প্রভাবিত করতে পারে যে, তারা মৌলিক আরাম বা প্রয়োজনীয় জিনিসও ত্যাগ করে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

- **ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:** ইসলামে কৃপণতাকে অপব্যয়ের মতোই একটি নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- **কোরআনে উল্লেখ:** পবিত্র কোরআনে কৃপণতাকে মানুষের একটি মন্দ স্বভাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।
- **অনুমতি ও নিষেধ:** আল্লাহ তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করতে উৎসাহিত করলেও, কৃপণতা করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন।
- **শয়তানের প্রভাব:** কৃপণতা শয়তানের একটি পছন্দনীয় স্বভাব এবং যারা এতে লিপ্ত হয় তারা শয়তানের অনুসারী হয়।

মানসিক ব্যাখ্যা

- জ্ঞানীয় কৃপণতা: মনোবিজ্ঞানে, কৃপণতার একটি ধারণা রয়েছে যা হলো "জ্ঞানীয় কৃপণতা"। এর অর্থ হলো, মানুষ সবসময় কম পরিশ্রমে বা সহজ উপায়ে চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করতে চায়।
- **জ্ঞানীয় প্রচেষ্টার ব্যয় এড়ানো:** এই মানসিকতা মানুষের মনকে জ্ঞানীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করা এড়াতে সাহায্য করে।

মান অভিমান সুখের অন্তরায়

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে, এমনকি কর্মক্ষেত্রের নানা ঘটনায় মান-অভিমানে ভারী হয় মানুষের মন। কখনো কখনো এই মান-অভিমান সম্পর্কের ছেদ টেনে দেয়। ফলে অতি আপনজনের সঙ্গেও বন্ধ হয়ে যায় কথাবার্তা, যোগাযোগ ও মুখ দেখাদেখিও। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে মূল্য দিলেও কিন্তু তা যখন সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্ন হয়ে ওঠে তাকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৭৬)

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক : হাদিসবিশারদরা বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলমানের সঙ্গে কথা বন্ধ করার ব্যাপারে তিন দিনের অবকাশ দিয়েছেন, যেন মানুষ তার রাগ, ক্ষোভ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়। হাদিসের শিক্ষা হলো, মানুষের আবেগকে মূল্যায়ন করতে হবে। তবে তা যদি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সংকট তৈরি করে তবে তা বর্জন করতে হবে।

বিশেষত যখন আবেগ সৃষ্টির পেছনে কোনো নৈতিক ভিত্তি ও শরয়ি কারণ না থাকে।

অভিমান যেন বিদ্বেষে পরিণত না হয় : মান-অভিমান থেকে যে দূরত্ব তৈরি তা যেন পরস্পরের মনে বিদ্বেষ তৈরি করতে না পারে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমল পেশ করা হয়। আল্লাহ সব মুসলিমকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে তার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল, তাদের ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা মিলিত হয়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৫)

হাসিমুখ ইসলামের কাম্য : মান-অভিমান আড়াল করে হাসিমুখে কথা বলাই ইসলামের নির্দেশনা। রাসুলুল্লাহ (সা.) হাসিমুখে কথা বলাকে সদকা আখ্যা দিয়ে বলেন, 'প্রতিটি ভালো কাজই সদকাস্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সহাস্য দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেওয়াও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭০)

সম্পর্কচ্ছেদ হত্যাতুল্য : সম্পর্কচ্ছেদ কোনো কোনো মানুষের জন্য মৃত্যুতুল্য।

প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো কখনো মানুষকে অস্বাভাবিক জীবন, এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ জন্য দীর্ঘ বিচ্ছেদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, 'যে তার ভাইয়ের সঙ্গে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখল সে যেন তাকে হত্যা করল।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৯১৫)

যে অভিমান ভাঙে সেই উত্তম : মানবিক আবেগের কারণে পরস্পরের প্রতি অভিমান সৃষ্টি হতে পারে। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই উত্তম যে অভিমান ভাঙতে এগিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে দুজনের দেখা হলেও দুজন দুদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে সে-ই উত্তম ব্যক্তি।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৭৭)

দ্বিনের প্রশ্নে কথা বন্ধ রাখা বৈধ : আল্লামা ইবনুল আরাবি মালেকি (রহ.) বলেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে কাউকে সতর্ক করতে অথবা অন্যকে পাপী ব্যক্তির পাপ সম্পর্কে সতর্ক করতে যদি তার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখা হয়, তবে তা বৈধ। যেমন কেউ কোনো পাপকাজ করল অথবা বিদআতে লিপ্ত হলো। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়া তিন সাহাবির সঙ্গে ৫০ দিন কথা বন্ধ রাখার অনুমতি দেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাহাবিরা তাদের সঙ্গে আগের মতোই সদ্ব্যবহার করেন।' (আরিদাতুল আহওয়াজি : ৮/৯১)

আল্লাহ সবার জীবনকে সুন্দর করে দিন। আমিন।

অযথা তর্কে না জড়ানো

সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। ইসলামে মিথ্যা, অযথা কথাবার্তা কিংবা গোড়ামি তথা তর্কাতর্কির সুযোগ নেই। এসব কাজ মানুষের জন্য দুনিয়ায় যেমন সম্মানহানী ও ক্ষতির কারণ তেমনি পরকালেও তা চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ। যা থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য খুবই জরুরি।

কোনো ঈমানদার ব্যক্তিই মিথ্যা কিংবা গোড়ামি করতে পারে না। ইসলাম মিথ্যা এবং গোড়ামি তথা বেহুদা তর্কাতর্কিকে সমর্থন করে না। ইসলামের জন্য কোনো বিষয়েই মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই।

তবে ইসলাম মানুষকে সত্যের ব্যাপারে উত্তম ও যুক্তিসঙ্গতভাবে তর্ক করর অনুমোদন দেয়। তারপরও যারা এ উত্তম তর্ক থেকে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কারের ঘোষণা। উত্তমভাবে তর্ক করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن-

(হে রাসুল!) আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।' (সুরা নাহল : আয়াত ১২৫)

এ আয়াতে ইসলামের জন্য তর্ক করার বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তবে তা করতে হবে যুক্তির সঙ্গে ন্যয় সঙ্গতভাবে। অন্যায়-অশ্লীল যুক্তি, কথাবার্তার মাধ্যমে কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামের দাওয়াত তথা ধর্মের কথা বলা যাবে না।

যে ব্যক্তি অসত্য পথ ত্যাগ করে, অন্যায়ের পক্ষে তর্ক করা থেকে বিরত থাকে এমনকি ন্যয়ের পক্ষে থেকেও তর্ক করে না এবং ইসলামসহ জীবনের কোনো পর্যায়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না; ওই ব্যক্তির দুনিয়া ও পরকালের নাজাত সহজ এবং উত্তম। হাদিসে পাকে এসেছে-হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অন্যায়ের পক্ষে তর্ক করে না, তার জন্য জান্নাতের এক পার্শ্বে একটি ঘর তৈরি করা হয়। আর যে ব্যক্তি ন্যায়ের পক্ষে থেকেও তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘর তৈরি করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরের অংশে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।’ (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বয়হাকি)
এ হাদিসের আলোকে বুঝা যায়, যদিও উত্তম ও যুক্তিসঙ্গতভাবে তর্ক-বিতর্ক করার অনুমোদন রয়েছে ইসলামে, তথাপিও যারা তর্ক পরিহার করে চলবে তাদের জন্য জান্নাত উত্তম বাসস্থান লাভের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্য হাদিসে এসেছে-
হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পাশ্বদেশে একটি, জান্নাতের মধ্যভাগে একটি এবং জান্নাতের উপরিভাগে আরও একটি ঘরের জামিন হচ্ছি। যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসের ছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজের চরিত্রকে সুন্দর করে।' (মুসনাদে বাযযার, তারগিব)
সুতরাং মুমন মুসলমানের উচিত, সব ধরনের তর্ক-বিতর্ক, মিথ্যা ও অমূলক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। তর্ক করা ছাড়া ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরা। নিজেদের সত্যবাদী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা।
আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে অযথা তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। নৈতিক ও উন্নত চরিত্র গঠনের তাওফিক দান করুন। হাদিসের উপর যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সন্দেহ ও কুধারণা পরিহার

মানুষের জীবনে অন্তরের প্রভাব অপরিসীম। জীবনের বড় একটি অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় অন্তরের প্রভাবে। যার অন্তর সুন্দর তার থেকে প্রকাশ পায় সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর কথা, সুন্দর কাজ। পক্ষান্তরে যার অন্তর অসুন্দর, তার থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। মানুষ যেমন সুন্দর অন্তরের মানুষ পছন্দ করে, তেমনি আল্লাহর কাছেও সুন্দর-সুস্থ মন প্রিয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)’ (সুরা শুয়ারা : ৮৯)। মুমিনের জীবন হবে স্বচ্ছ, সুন্দর ও নিষ্কলুষ। মুমিনের আছে নানা গুণ। মুমিন যেমন প্রতারণা করে না, নিজেও প্রতারিত হয় না। প্রকৃত মুমিন কারও সম্পর্কে কুধারণা করে না। অন্যকেও নিজ সম্পর্কে সন্দেহ বা কুধারণা করার সুযোগ দেয় না। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে মুমিনের উচিত সে সন্দেহের অবসান করা। বিশেষত দ্বীনের দায়ী ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য এটা অপরিহার্য। কারণ সবার কাছে বরণীয় ও গ্রহণযোগ্য না হলে

দাওয়াতের কাজ করা কঠিন। তাই নিজেকে ক্লিন ইমেজে রাখতে, সন্দেহের ঊর্ধ্বে জীবনযাপন করতে হবে।

হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ইতেকাফরত ছিলেন। আমি রাতের বেলা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। কিছু সময় রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে কথা বললাম। তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় দুজন আনসারি সাহাবি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রাসুল (সা.)-কে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে দেখে দ্রুত যেতে লাগল। তখন রাসুল (সা.) বললেন, তোমরা ধীরে চলো। এ কিন্তু আমার স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই! তারা দুজন বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসুলাল্লাহ (আমরা তো কিছু মনে করিনি)। তখন রাসুল (সা.) বললেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলে। আর আমি শঙ্কিত হলাম যে, সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোনো কুধারণা কিংবা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে' (মুসলিম : ৫৪৯২)। হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসুল (সা.) স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু সাহাবাদ্বয় সেটা জানতেন না। শয়তান তাদের অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাসুল (সা.) তাদের সংশয় সৃষ্টির পূর্বেই তা নিরসন করে দিলেন।

কুরআনুল কারিম থেকেও আমরা এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। বিবরণটা এমন-মিসরের মন্ত্রীর স্ত্রী জুলেখা হজরত ইউসুফ (আ.)-কে অপকর্মের জন্য প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু নবী ইউসুফ (আ.) নিজেকে পূত-পবিত্র রাখলেন। এটা সবার কাছে স্পষ্ট ছিল। তথাপি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য মিসরের বাদশা ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে প্রেরণ করলেন। লাগাতার কয়েক বছর ইউসুফ (আ.) কারাগারেই কাটালেন। এরপর ইউসুফ (আ.) মিসরের বাদশার দেখা স্বপ্নের বিবরণ, দেশে সমাগত দুর্ভিক্ষ ও তার উত্তম প্রতিকার বলে দিলেন। তাই বাদশা ইউসুফ (আ.)-কে জেল থেকে বের করার নির্দেশ দিলেন। বাদশার প্রতিনিধি কারাগারে ইউসুফ (আ.)-কে মুক্তির সংবাদ শোনালেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) মুক্তির পূর্বে নিজের ওপর আসা অপবাদের স্পষ্ট নিরসন চাইলেন। অন্যদের অন্তরে যেন কুধারণা না জন্মায়, তাই বাদশার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি কামনা করলেন। তাই ইউসুফ (আ.) বাদশার দূতকে বললেন, সেসব মহিলার বিষয়টা বাদশাকে স্পষ্ট করতে বলো। (তাফসিরে মায়ারেফুল কুরআন)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস করো তাকে ওই মহিলাদের স্বরূপ কী, যারা নিজেদের হাত কেটেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন। বাদশা মহিলাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের হাল-হকিকত কী? যখন তোমরা ইউসুফকে তার আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল, আল্লাহ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীয-পত্নী তখন বলল, এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে। আমি

তাকে নিজের ব্যাপারে ফুসলিয়েছিলাম এবং তিনি (ইউসুফ) সত্যবাদী।' (সুরা ইউসুফ : ৫০-৫১)

এ বিষয়ে হজরত ইমাম বুখারি (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। ইমাম বুখারি (রহ.) হাদিস সংগ্রহ করার জন্য একবার নদীপথের সফরে ছিলেন-কিশতিতে। সঙ্গে ছিল ১ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)। এক চোর কোনোভাবে দিনারগুলো দেখে ফেলেছিল। চৌকস সে চোর সব যাত্রীর সামনে ঘোষণা করল, তার ১ হাজার দিনার চুরি হয়ে গেছে। দিনারের বিবরণও প্রদান করল। ইমাম বুখারি (রহ.) চোরের ঘোষণা শুনে অবাক হলেন। কারণ নির্দিষ্ট বিবরণের দিনার তো তার নিজের কাছেই আছে। দিনার উদ্ধারের জন্য একজন একজন করে সব যাত্রীকে চেক করা হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে ইমাম বুখারি (রহ.) থলের দিনারগুলো পানিতে ফেলে দিলেন। এক পর্যায়ে ইমাম বুখারি (রহ.)-কে চেক করা হলো। কিন্তু অবাক! তার কাছে দিনারগুলো পাওয়া গেল না। পরে সে চোর ইমাম বুখারি (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল। আপনি দিনারগুলো কী করেছেন? উত্তরে বললেন, আমি দিনারগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছি। চোর বড়ই আশ্চর্য হলো। ইমাম বুখারি (রহ.) তখন বললেন, দেখো, আমি একটি হাদিসের কিতাব লিখছি। মানুষ এ থেকে ইলম অর্জন করবে। আজ যদি আমার গায়ে চুরির অপবাদ লাগে, তবে মানুষের মনে আমার সম্পর্কে কুধারণা জন্মাবে। বলবে এটি একটি চোরের লিখিত কিতাব। সুতরাং আমি নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে, অন্যদের কুধারণা দূর করার জন্য দিনারগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ! (সীরাতু ইমাম বুখারি লিলমুবারকপুরী : ১/১২২-১২৩ পৃ.)। এসব বিবরণ থেকে আমরা জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। বিশেষ করে যারা ধর্ম প্রচারক, দ্বীনের দায়ী। নিজেদের সবসময় সবার কাছে গ্রহণযোগ করে রাখব। সন্দেহ সৃষ্টি হয় এমন কথা-কাজ থেকে বিরত থাকব। কখনো অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সাধ্যমতো সে সন্দেহ-সংশয় নিরসন করব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

পরমসহিষ্ণুতা রক্ষা

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব বা 'আশরাফুল মাখলুকাত'। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব তার 'ইলম' তথা বুদ্ধি-বিবেক বা জ্ঞানের জন্য। এই জ্ঞানের জন্যই মানুষের অবস্থান ফেরেশতার ওপরে। মানুষকে মহান আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন চিন্তার স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য। তাই মানুষের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষ পরিচালিত হয় তার স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী। মানুষ ভালো-মন্দ বিচার করে যার যার জ্ঞানের আলোকে। জ্ঞানের ভিত্তি হলো তথ্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা সব নবী-রাসুলকে সত্য তথ্য প্রচারের জন্য দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, জোর করে বাধ্যতামূলক বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নয়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষকরূপে পাঠাইনি। শুধু বাণী পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন আপনার কোনো দায়িত্ব নেই' (৪২:

৪৮)। '(হে রাসুল!) আপনি উপদেশ দিন, আপনি উপদেশদাতা ভিন্ন নন। আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন। তবে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে ও কুফরি করবে, আল্লাহ তাদের মহাশাস্তি দেবেন। তারা আমার কাছেই ফিরে আসবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ আমারই দায়িত্বে' (৮৮: ২১-২৬)।

ইমান বা বিশ্বাস হলো জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই ইমান আনার ক্ষেত্রে ইসলামে বলপ্রয়োগের বা জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই। মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের, হেদায়াত ও গোমরাহির বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা ছিল নবী-রাসুলদের দায়িত্ব। ইমান আনা না-আনার বিষয়টি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'দ্বীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য ভ্রান্তি হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে ইমান আনল, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল, যা কখনো ভাঙার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ২৫৬)।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও উদারতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ দুটি গুণ। এর বিপরীত হলো ধৈর্যহীনতা, অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা, কার্পণ্য, হীনতা, নীচতা, অভব্যতা। এসব আল্লাহ তাআলার অপছন্দের। যাদের অন্তর বদগুণ থেকে মুক্ত হয়েছে, তারাই সফল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন সম্পদ ও সন্তান (শক্তি) কোনো কাজে আসবে না, বরং যারা আল্লাহর সমীপে উপনীত হবে গরলহীন অন্তরে' (২৬: ৮৮-৮৯)।

কারও সঙ্গে দ্বিমত, ভিন্নমত বা মতপার্থক্য হলে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ভালো ও মন্দ সমান নয়, তুমি প্রতিহত করো মন্দকে তা দিয়ে যা উত্তম; ফলে তোমার ও যার মধ্যে চরম শত্রুতা, সে তোমার পরম বন্ধুতে পরিণত হবে' (৪১: ৩৪)।

সংকীর্ণতার বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'তারা বলে ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এটি তাদের অলীক আশা। বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো। হ্যাঁ, কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার ফল তার রবের কাছে রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না। ইহুদিরা বলে "খ্রিষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই" এবং খ্রিষ্টানরা বলে "ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই" অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবে যারা কিছুই জানে না, তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা ফয়সালা করবেন' (২: ১১১-১১৩)।

বিচার ফয়সালার ভার আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে কোরআন কারিমে রয়েছে, 'নিশ্চয় যারা মোমিন আর যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ছাবিইন; তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তবে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বিনিময় রয়েছে' (২:৬২)। 'নিশ্চয় যারা মোমিন আর যারা ইহুদি, ছাবিইন, খ্রিষ্টান ও মাজুস এবং মুশরিক; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আল্লাহ সবকিছু সম্যক প্রত্যক্ষকারী' (২২: ১৭)।

শান্তি স্থাপনের জন্য উদারতা, সহিষ্ণুতা ও ছাড় দেওয়া প্রয়োজন হয়। কারও সঙ্গে দ্বিমত হলেই বিরোধিতা ও ফতোয়া প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেইন, তাবে-তাবেইন ও মুজতাহিদ ফকিহদের মধ্যেও ইমান, আকিদা, ইজতিহাদ ও ফিকহি মাসআলা এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে অনেক বিষয়ে বহু মতভিন্নতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও তাঁরা বিবাদে লিপ্ত হননি। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি। (বুখারি: ২৮৯,৩৪০)।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন মানবতার উৎকর্ষের পূর্ণতা সাধনের জন্য। তিনি বলেন, 'আমাকে পাঠানো হয়েছে সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের নিমিত্তে।' (মুসলিম ও তিরমিজি)। আল্লাহ তাআলা বলেন, '(হে মুহাম্মদ) নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।' (সুরা-৬৮ কলম, আয়াত: ৪)।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শ্রেষ্ঠ মানবিক উত্তম গুণাবলির অন্যতম। পবিত্র কোরআনে স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। ধৈর্যের আরবি হলো 'সবর'। সহিষ্ণুতার আরবি হলো 'হিলম'। সবর ও হিলম শব্দ দুটির মধ্যে কিঞ্চিৎ তাত্ত্বিক তফাত আছে। সাধারণত সবর তথা ধৈর্য হলো অপারগ, অসমর্থ ও অসহায় অবস্থায় অন্যায়ের শিকার হয়ে প্রতিশোধস্পৃহাকে দমন করে রাখা। আর হিলম, অর্থাৎ সহিষ্ণুতা মানে হলো শক্তি-সামর্থ্য থাকার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। সবর বা ধৈর্য অপেক্ষা হিলম তথা সহিষ্ণুতা উন্নততর। তবে এ উভয় শব্দ কখনো কখনো অভিন্ন অর্থে তথা উভয় অর্থে ও একে অন্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়। হিলম তথা সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।' (সুরা-২২ হজ, আয়াত: ৫৯)। সবর তথা ধৈর্য বিষয়ে হজরত আইয়ুব (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। সে কত উত্তম বান্দা! সে ছিল আমার অভিমুখী।' (সুরা-৩৮ সদ, আয়াত: ৪৪)। 'নিশ্চয় ইহাতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।' (সুরা-১৪ ইব্রাহিম, আয়াত: ৫)।

সামাজিক জীব মানুষ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধভাবে থাকতে গেলে ক্ষমা, দয়া-মায়া ও ভালোবাসা থাকতে হবে। শান্তির সমাজ, স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থানের জন্য সহনশীলতা অপরিহার্য

সফলতা, শান্তি ও সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)। 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সুসম্পর্ক স্থাপনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অবিচল থাকো, আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সুরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)। 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।'

(সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৫৩)। 'আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭)।

হজরত ইউনুস (আ.)-কে সামান্য অধৈর্য হওয়ার কারণে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের আঁধারে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে হিংস্র মৎস্য উদরে যেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচর (ইউনুস)-এর ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।' (সুরা-৬৮ কলম, আয়াত: ৪৮)। ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হজরত আইয়ুব (আ.) আঠারো বছর পর্যন্ত সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরম সাফল্য লাভ করেছিলেন।

ধৈর্য তিন প্রকার, যথা 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায় অপরাধ হতে বিরত থাকা। 'সবর আলাত তআত', অর্থাৎ ইবাদত আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকর্মে কষ্ট স্বীকার করা। 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অধীর না হওয়া। ধৈর্যাবলম্বনকারীর জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা অবশ্যম্ভাবী। (তাফসিরে বায়জাবি)।

শেষ কথা

পরিশেষে প্রকৃত সুখ হলো আত্মার প্রশান্তি ,রব্বের সন্তুষ্টি, দ্বীনদার জীবনসঙ্গী,নেককার সন্তান,হালাল রিজিক,এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও অপরের কষ্টে নিজে কষ্ট পাওয়া।

এ দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন বিদেশী অথবা পথিক।" (অর্থাৎ বিদেশীর মতো বা পথিকের মতো হাল্কা বোঝা নিয়ে জীবনযাপন কর)।

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রাসাদে, হারুনুর রশীদের সেনাবাহিনীতে, ইবনে জাসসাসের অট্টালিকায়, কারূনের ধনভাণ্ডারে অথবা গোলাপের বাগানে সুখ নেই। কল্যাণ ও সুখ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের (রাঃ) ভাগ্যে ছিল, যদিও তারা গরীব ছিলেন এবং কঠিন জীবনযাপন করতেন। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সুখ ছিল হাদীস সংগ্রহের মাঝে, হাসান বসরীর সুখ ছিল তার সত্যবাদিতার মাঝে, ইমাম শাফীঈ (রহঃ)-এর সুখ ছিল তার অনুসিদ্ধান্তের মাঝে, ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদের (রহঃ) সুখ ছিল তাদের অন্তদৃষ্টি ও আত্মসংযমের মাঝে এবং ছাবিত আল-বান্নায়ির সুখ ছিল তার ইবাদতে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“কেননা, আল্লাহর রাস্তায় তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা হয়, কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেককারী যে পদক্ষেপ তারা নেয় এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা তাদের জন্য আমলে সালেহ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ আমলে সালেহকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।” (৯-সূরা তাওবাঃ আয়াত-১২০)

সুখতো আর টাকার চেক, কেনা গাড়ি বা পাম্প করে উঠানো তেল নয়। সুখ হলো সত্যের উপর থাকার ফলে উৎপন্ন শান্তি, সুখ হলো সুযুক্তিপূর্ণ বিচক্ষণ, নির্ভরযোগ্য ও উপকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার ফলে অর্জিত মনের শান্তি এবং সুখ হলো ভালো জীবনযাপন করার ফলে সৃষ্ট শান্তভাব। আমরা ভাবতাম যে, যদি আমরা আরো বড় একটি বাড়ি কিনতাম। আরো জিনিস-পত্র থাকত, যদি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং জীবনকে সহজতর করে এমনসব মেশিন-পত্র কিনতাম, তবে আমরা সুখী ও আনন্দিত হতাম। কিন্তু পরে যখন দেখলাম এ জিনিসগুলোই আমাদের জীবনের দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ও সমস্যার কারণ তখন আমরা এতে বিস্মিত হয়ে গেলাম ।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

“দুনিয়ার জীবনের যে জাকজমক ও সৌন্দর্য তাদের কিছু দলকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ভোগ করতে দিয়েছি, আপনি কিছুতেই সেদিকে আপনার চোখদ্বয়কে প্রসারিত করবেন না।” (২০-সূরা ত্বাহাঃ আয়াত-১৩১)

হেদায়েতের বার্তাবাহক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। আর্থিকভাবে তিনি ছিলেন দরিদ্য; মাঝে মাঝে ক্ষুধা মিটানোর জন্য একটি নিম্নমানের খেজুরও পেতেন না। এসব সমস্যা, জটিলতা ও কষ্ট সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক অনুপম পর্যায়ের কল্যাণ ও শান্তির জীবনযাপন করতেন, যার প্রসারতা ও বিস্তার মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

“আর আমি আপনার থেকে বোঝাকে (দুশ্চিন্তাকে) দূর করে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল (অর্থাৎ যা আপনার জন্য খুব কষ্টকর ছিল।)”

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

“এবং আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ খুবই মহান।” (৪-সূরা আন নিসাঃ আয়াত-১১৩)

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

“আল্লাহ ভালোই জানেন কাকে তার রিসালাত দিবেন।” (৬-সূরা আন’আমঃ আয়াত-১২৪)

একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

“উত্তম চরিত্রই পুণ্য আর তোমার বিবেক যে কাজে বাধা দেয় এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি পছন্দ কর না তাই পাপ।”

পুণ্যকর্ম (আমলে সালেহ) বিবেক ও আত্মা উভয়কেই শান্ত করে বা শান্তি দেয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ألبر طما نينة والاثم ريبة

"পুণ্যকর্ম হল মনের প্রশান্তি আর পাপ হলো মনের অনিশ্চয়তা (সন্দেহ)।"

পুণ্যকর্মকারী সর্বদা শান্তিতে থাকেন আর পাপী তার চারিদিকে কি হচ্ছে তা নিয়ে সর্বদা সতর্ক ও সন্দেহ প্রবণ।

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

"তারা মনে করে প্রতিটি চিৎকারই (শব্দই) তাদের বিরুদ্ধে (উচ্চারিত হচ্ছে)"। (৬৩-সূরা মুনাফিকূনঃ আয়াত-৪)

অন্যায় অত্যাচার ও পাপকারী উদ্বিগ্নতা থেকে সন্দেহে এবং অবশেষে বুদ্ধি বৈকল্য (নামক) রোগে ভোগে। এক আরব কবি বলেন-

إذا ساءَ فِعْلُ المرْءِ ساءَتْ ظُنُونُهُ * وَصَدَقَ مَا يَعتَادُهُ من تَوَهُّمِ

কেউ মন্দ কাজ করলে সে সন্দেহে ভোগে, আর তার মনে যে কল্পনা আসে সেটাকেই সে বিশ্বাস করে।যে সুখ তালাশ করে তার জন্য ভালো কাজ করা ও মন্দ কাজ পরিহার করার মাঝেই স্পষ্ট সমাধান আছে।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

"যারা ঈমান আনে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলে না তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (৬-সূরা আন'আমঃ আয়াত-৮২)

আত্মিকভাবে সুস্থ মুসলিম হওয়া রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার চেয়েও ভালো (ইংরেজি অনুবাদক এখানে নাম সংক্রান্ত ভুল করেছেন তাই আমি ভাবানুবাদ করলাম। কেননা, এখানে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, পার্থিব বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ার চেয়ে মুসলিমের নিকট আত্মার শান্তি বেশি ভালো -অনুবাদক) কেননা, ধর্ম (দ্বীন ইসলাম) আপনি বেহেশতের বাগানে বসতি গড়া পর্যন্ত আপনার সাথে থাকবে। ক্ষমতা ও পদমর্যাদা শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

"নিশ্চয় আমি পৃথিবী ও এর উপর যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আমার নিকটই সব কিছু ফিরিয়ে আনা হবে।" (১৯-সূরা মারইয়ামঃ আয়াত-৪০)